গল্প সংখ্যা

সন্দেশ

চৈত্র
১৪০৮

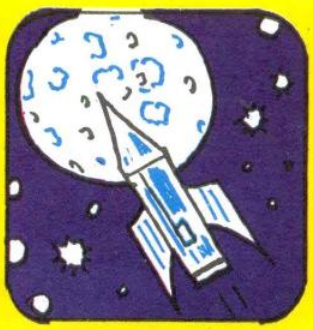

ছোটদের
সেরা
মাসিকপত্র

এস্পার-ওস্পার...পুজোর পরেই—

এক বছর আগে চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় বলা হয়েছিল 'সন্দেশ'-এর পরিকল্পনার কথা। কিন্তু সারা ১৪০৮ ল্যাগব্যাগ করে চলছে সন্দেশ। ব্যাপার -স্যাপার কী?

"সন্দেশ' কি তাহলে ত্রৈমাসিক হয়ে গেল?' প্রশ্ন এক সন্দেশীর।

'সে কী!' বিরক্ত খুদে গ্রাহক, 'পরের সংখ্যা এ-খ-ন-ও বেরলো না!'

'আপনারা কি পত্রিকা চালাবেন, না বন্ধ করবেন?' খোলাখুলি প্রশ্ন করল এক স্টল-মালিক।

এক লেখকের প্রশ্ন, 'বার বার ঘোষণা করছেন কি সব যেন করবেন, কবে যে কি যে করবেন কিছুই তো বুঝছি না!'

'একেই দেশে অর্থনৈতিক মন্দা, সবাই বিজ্ঞাপনের খরচা কমাচ্ছে;' বললেন সেই বড় অফিসের মেজোসাহেব, 'এই অবস্থায় এমন ইররেগুলার বই বেরোলে বিজ্ঞাপন পাবেন কী করে?'

গত দেড় বছর ধরে 'সন্দেশ'-এর পরিকল্পনার কাজ চলছে। কিন্তু উদ্দেশ্য তো পুরানো দেনা কাটিয়ে নিয়মিতভাবে এক আধুনিক ঝকঝকে রঙিন পত্রিকা বের করা। প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোনও একটি সংস্থার কাছ থেকে কি এত টাকা পাওয়া সম্ভব?

উপায় নেই, একটু বেশিই সময় লাগছে। অনেক কসরৎ করে টাকার ব্যবস্থা হয়েছে ২০০১-এর আগস্ট থেকে ২০০২-এর মে মাসের মধ্যে। এর পরেও কিছু সরকারী অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েক মাস।

কিন্তু ডিসেম্বর বা জানুয়ারি থেকে এস্পার-ওস্পার! নতুন 'সন্দেশ' এবার আসছেই।

(১) বছরে নিয়মিত ১১টি সংখ্যা।
(২) প্রতি সাধারণ সংখ্যায় অন্তত ১৬টি রঙিন পাতা।
(৩) প্রতি সাধারণ সংখ্যায় প্রচ্ছদকাহিনী।
(৪) শারদীয়া বাদে তিনটি বিশেষ সংখ্যা।
(৫) কলকাতার সব পত্রিকার স্টলে 'সন্দেশ' পাওয়া যাবে।
(৬) ক্রমশ 'সন্দেশ' পাওয়া যাবে সব শহরে যেখানে বাংলা বই-পত্রিকা বিক্রি হয়।

প্রকল্প রূপায়ণে : সন্দীপ রায়। প্রসাদরঞ্জন রায়। অমিতানন্দ দাশ

সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ।
কলকাতা ৭০০ ০২৯ ✆ ৪৬৬-৪৯১৯
e-mail : adas@onlysmart.com

Hindustan

US MEDIA SLAM PERVEZ SWEEP IN REFERENDUM

Good tidings for Sandesh

হিন্দুস্তান টাইম্স্ কলকাতা সংস্করণ ৩রা মে প্রথম পৃষ্ঠা

* অনিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য যাদের কার্তিক ১৪০৮ বা তার বেশি চাঁদা দেওয়া আছে প্রত্যেকে 'সন্দেশ'-এর একটি বাড়তি সংখ্যা পাবেন।

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছোটদের সেরা মাসিক পত্র

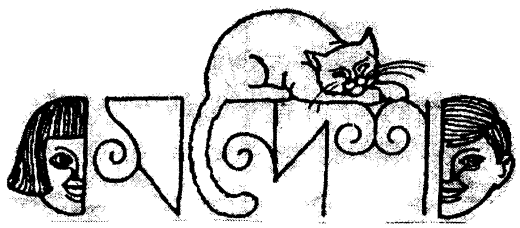

গল্পসংখ্যা

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৪০। সংখ্যা ১০-১২। মাঘ-চৈত্র ১৪০৮

গল্প

টুপসি আর পলুদের গল্প। সলিল চট্টোপাধ্যায়। ৪
গজাননের স্বপ্ন। শিবানী রায়চৌধুরী। ৯
ঘনামামার ভোটিদান। শৈলেনকুমার দত্ত। ১৫
স্বীকারোক্তি। লায়লী দাশ। ১৮
মেজদাদার উদ্ভিদ পালা। দীপঙ্কর বিশ্বাস। ২৫
সেই লোকটা। অরুণিমা রায়চৌধুরী। ৩৩
রাখে কৃষ্ণ মারে কে?। শোভেন সান্যাল। ৩৭
মজার সেই দিনগুলি। জয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪৪
খ্যাঁকশেয়ালের গল্প। সুনির্মল চক্রবর্তী। ৪৮
অশ্বত্থামার পা। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। ৫২
মোতিউরের বাঘের গপ্‌পো। বিমান ঘোষ রায়। ৬০
রুনু ঝুনু ও একানড়ের গল্পো। দীপাঞ্জন রায়। ৬১

প্রবন্ধ

যবদ্বীপে মহাভারতের কাহিনী। ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪১

ছড়া-কবিতা

ছোঁয়াচ। অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৭
প্রকৃতির ভারসাম্য। প্রদীপকুমার রায়। ২২
চৈত্র-চিত্র। রেবন্ত গোস্বামী। ৩২
বাস পাঠালাম। যতীন্দ্রমোহন মজুমদার। ৪৩
সংলাপ। সংঘমিত্রা কর। ৪৭
ক্যাওড়াতলার বিধানসভায়। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। ৫৯
তা দেখে। সুনীতি মুখোপাধ্যায়। ৬৫

বিভাগীয়

বুনো রামনাথের দপ্তর (কোলকাতা না **কলকাতা**)। ১৩
ধাতু : ১৮। ট্যান্টালাম। ১৪
হাত পাকাবার আসর। ৬৬

সম্পাদক :

লীলা মজুমদার বিজয়া রায়

সহযোগী সম্পাদক

সন্দীপ রায়

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

কালি প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯ বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

সন্দেশ কার্যালয়, ১৭২/ ৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০২৯ থেকে অমিতানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড।

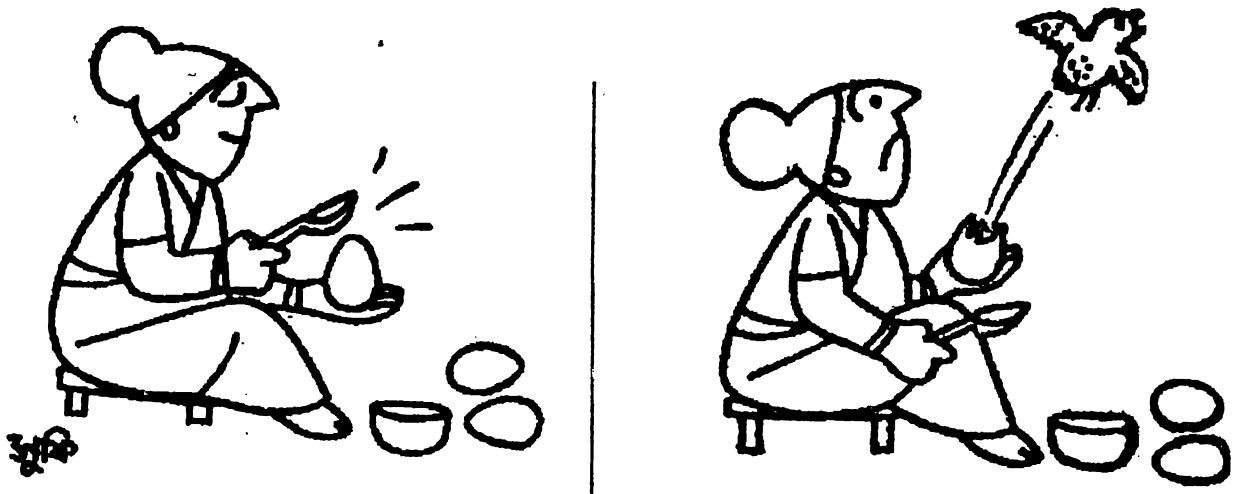

হায়! হায়!! হায়!!! হায়!!!! হায়!!!!!
ডালনার ডিম উড়ে যায়!

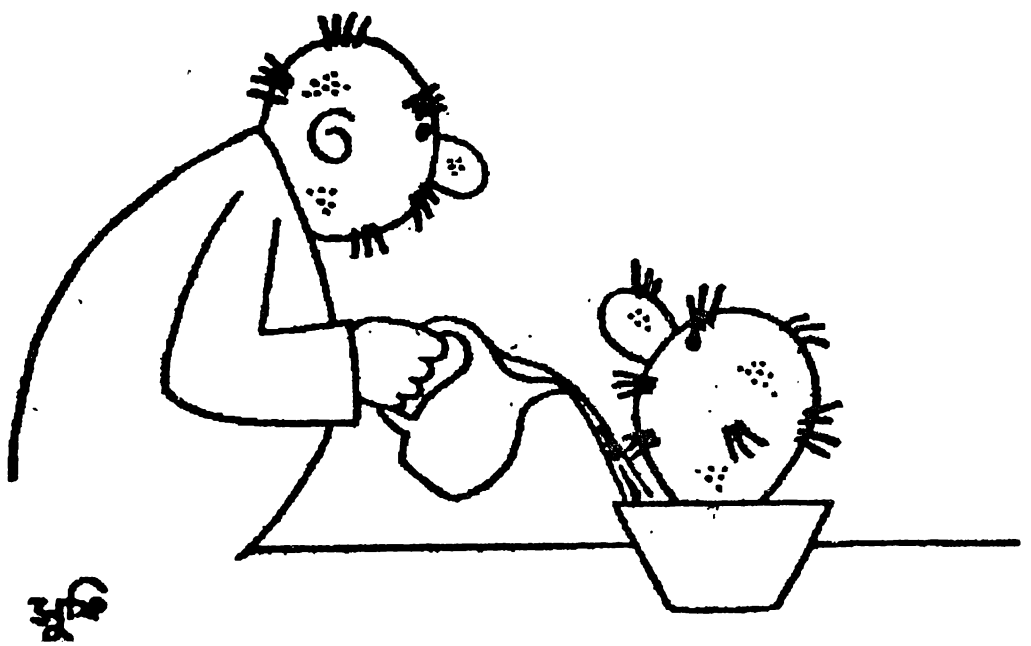

সহানুভূতি

সন্দেশ

ফেব্রুয়ারি—এপ্রিল ২০০২ মাঘ—চৈত্র ১৪০৮

মায়ের এবার ছুটি

জয়ন্তী পুরকায়স্থ

ছোট্ট পাখির ছানার যখন
চোখটা বন্ধ থাকে,
ঝড়ঝাপটা বিপদে মা
আড়ালে করে রাখে।

ছোট্ট পাখির ছানা তখন
করেই থাকে হাঁ,
খাবার জড় করে নিয়ে
মা বলে, 'নে, খা।'

ছোট্ট পাখির ছানার যখন
ছোট্ট ছিল ডানা;
কাক চিল সব ওৎ পেতে রয়,
বাইরে যেতে মানা।

ছোট্ট পাখির ছানা এবার
দিব্যি বড় হয়,
উড়তে পারে ডানা মেলে
আর করে না ভয়।

ছোট্ট পাখির ছানা এবার
আনতে শেখে খাবার,
খিদে পেলে মায়ের মদত
আর তো লাগে না তার।

ছোট্ট পাখির ছানা এবার
মেললো ডানা দু'টি
মিলিয়ে গেল নীল আকাশে,
মায়ের এবার ছুটি।

টুপসি আর পুতুলের গল্প

সলিল চট্টোপাধ্যায়

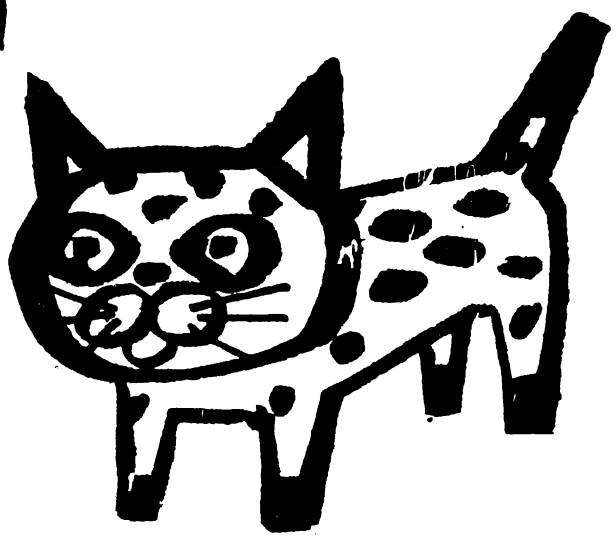

মামাবাড়ি বেড়াতে এসেছে টুপসি। এমন নয় যে মামাবাড়িটা মস্ত বড় বা খেলাধূলার মেলা জায়গা। মোটেও তা নয়। সরু একটা গলির ভেতরে ছোট বাসা। পুরোনো বাড়ির ছোট দুখানা ঘর আর একটু চাতাল—তার একদিকে রান্না আর অন্য দিকে স্নান ঘর। তবু ছাতটা আছে, আর ছাতে টবে টবে কত যে ফুল গাছ। আর এখন দ্যাখো ফুলে ফুলে রঙে রঙে কী সুন্দর! টুপসি পারলে সারাদিন এই ছাতেই কাটিয়ে দিত। খেলার সঙ্গি বলতে ওই বঙ্কু পুঁচকেটা। কথায় তো টলোমলো, অনেক কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু টুপসির খুব ভক্ত। সব সময়ে দেখো গায়ে গায়ে লেগে আছে, যেন এঁটুলিটা।

আসলে তার মামাবাড়িতে যে মজাটা আছে, তা কিন্তু আমাদের কারো নেই। তোমাদের আছে কিনা জানি না। টুপসির মামার আছে পুতুলের দোকান। দোকানে অবশ্য পুতুল ছাড়া সাজবার জিনিস, মাখন, বিস্কুট এসব অনেক কিছুই আছে। কিন্তু দোকানের নামটা ইংরেজিতে লেখা বেশ রঙচঙে পেঁচিয়ে মেচিয়ে—'ডল্‌স্ হাউস'। তাই পুতুলের দোকানই বলতে হবে। পুতুলও আছে নানান রকম—অজস্র অসংখ্য অনেক।

এই দ্যাখো না কেন—সামনেই কাচের দেয়াল তাকে সারি সারি বাহারি সাজে মেম পুতুলগুলো। তারপর খোকা খুকু, তারপর পেট মোটারা, ট্যারা চোখোরা, গালফুলোরা। তারপরে গাড়ি। গাড়ি আর গাড়ি। ছেলেদের খেলনা—তলোয়ার, তীরধনু, বন্দুক, পিস্তল এই সব। দোকানের ওই ভেতরে বাক্সে বাক্সে আরো আছে রান্নাবান্নার সেট, ডাক্তারির সেট, ঘর বানাবার সেট, ঘর সাজাবার সেট—সে যে কত, সব বলতে গেলে গল্পটাই আর বলা হয় কি না হয়।

এসব পুতুল কি মামু টুপসিকে নামিয়ে দিয়েছে খেলার জন্যে? তা নয়। কিন্তু দেখতে তো আপত্তি নেই কারো। তাই টুপসি বিকেলে কখনো মামুর হাত ধরে, কোনোদিন তাপুদার সাইকেলে এই দোকানে আসে। তাকে সাজানো পুতুলগুলোকে দ্যাখে, ওদের সঙ্গে গল্প করে। এমন যদি হয় কখনো দু একটা ভাঙা পুতুল বেরিয়েছে। ভাঙাটাতো বিক্রি হবে না, ব্যস্ হয়ে গেল। একটা টুপসির, একটা বঙ্কুর। বঙ্কুটা পুতুল বগলে ওই যে 'দিজি'র পেছনে ঘুরছে। ও কি আর খেলা বোঝে!

মামা বাড়িতে এলে সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায়! ছাতের বাগান, বাগানে ফুল, প্রজাপতি, ফড়িং, আর দোকানের মেলা মেলা পুতুল। মা কিন্তু ছাড়বে না। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে ঠিক ধরবে 'কই, হ্যান রাটটিংয়ের খাতাটা নি আয়।' নাহলে 'সকাল থেকে কটা অঙ্ক করেছিস দেখি!' এসব নিয়ে বেশি মন খারাপ করে না টুপা। দুপুরে ছাতে মা আর মামি বসে গল্প করে, উল বোনে। ও রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে অঙ্ক কষে, খাতার হাতের লেখা লেখে আর মাঝে মাঝে চারদিকে তাকিয়ে দেখে—সেই ডানায় বড় বড় চোখ আঁকা প্রজাপতিটা আসে নাকি,

কখন আসে। বঙ্কু কখনো ওর খাতা, কখনো কলম ধরে টানে। তারপর ওর পিঠে লেপ্টে গিয়ে গলা ধরে টানে বলে। বলে, 'দিজি ওত্।' বঙ্কু এমনি করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম পায় টুপসিরও। অনেক কষ্টে যখন হাতের লেখা শেষ হল আর ঘুম নেই। তাপুদার আসার সময় হল যে।

টুপসি জামা বদলে সেজেগুঁজে তার সাইকেলের সামনে বসে দোকানে যাবে। ফিরবে রাতে মামুর সঙ্গে। কোনোদিন মা গিয়ে আগেই নিয়ে আসে। আর আসলে মজা তো ওই দোকানে।

ওই যে পেটমোটা গালফোলা ঢ্যাবা চোখে—ওরা সবাই কিন্তু ফুর্তিবাজ। ফুর্তিবাজ আর আল্লাদী খোকা-খুকুরাও তবে মেম পুতুলদের কথা কিছু আলাদা। কী করবে, বলো? ওদের সাজপোশাকে এত খুঁটিনাটি, কত কায়দা করে চুল বাঁধা—একটুতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর নষ্ট হয়ে গেলে সবাই জানে ওই তাকেই পড়ে থাকবে, কেউ পছন্দ করবে না। তাহলে? মেম পুতুলরাই আর তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। থাকবে এককোণে ধুলোমাখা ময়লা হয়ে। এখানে থাকা তো বিক্রি হওয়ার জন্যে। তাই দেখো না দোকানে কেউ যদি পুতুল কিনতে এল, অমনি মেমদের সাজগোজের কম্পিটিশান। কে কেমন মুখে হাসি ফুটিয়ে নীল কটা চোখগুলো বড় বড় করে সুন্দর হয়ে থাকতে পারো। যাকে পছন্দ করে তুলে নিল, সে তো মুচকি হেসে বাক্সে উঠে চলে গেল। বাকিরা লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলছে, যে গেল তাকে গালাগাল দিচ্ছে, 'বেশি ঢঙ! দেখলি? কেমন কায়দা দেখিয়ে চলে গেল!' কেউ বলছে, 'যাক্ না। যে নিল, সে মেয়েটাকে দেখেছিস? একের নম্বর গুণ্ডা একটা। পুতুল কিনে দেবার জন্যে কিরকম মারছিল মাকে!' আমাদের 'লিজি'-র ভাবখানা যেন রানী হতে যাচ্ছে কি মিস্ ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবে না। তার আগেই হাত পা ছিঁড়ে চুলটুল খুলে ফেলে দেবে। এতক্ষণে হয়ত খোলাও হয়ে গেছে।' সবাই হাসছে হি হি-ফিক্ ফিক্-খুক্ খুক্।

ঢ্যাবা চোখো, পেটমোটা, গাল ফোলাদের এসব নেই। সাজ গোজ নিয়ে ভাবনা চিন্তাও নেই। ওদের সাজ পোশাক সব তো গায়েই আঁকা। জল দিয়ে ঘসলেও উঠবে না। কাকে পছন্দ করল, কাকে নিয়ে যাচ্ছে, এ সব নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামায় না। তবে দল ছেড়ে যাবার সময় সকলেরই মন খারাপ হয়। হয় তো তাকে জিগ্যেস করে—'চলে যাচ্ছিস?'

—'হ্যাঁরে ভাই। দেখছিস এই তোবলা গাল খোকাটা কেমন চেপে ধরেছে আমাকে!'

—'যা ভাই। ভালো থাকিস।'

'একা একা কি ভালো থাকা যায়?' সবারই দুঃখের শ্বাস পড়ে। সবচেয়ে বেশি যাচ্ছেও এরাই, রোজই চারপাঁচটা বিক্রি হয়।

সেদিন যা হল। এক বাড়ির বুঝি তিন ভাই বোন, ওই টুপসির মতো কি একটু ছোট হবে। এসেই ঢেবু, মোটু আর ফুলুদের তিনজনকে একসঙ্গে তুলে নিয়েছে। তাদের ওই চাই। সবাই বলছে, 'ভালোই হল রে। তোরা তিন জন একসঙ্গে থাকবি। কি মজা তোদের?'

মোটু মুখটা কেমন বেঁকিয়ে বলে, 'মজা তো এখনই টের পাচ্ছি। যেমন টিপে ধরেছে!'

—'একসঙ্গে তো থাকতে পারি।'

—'যদি না তার আগেই ফেটে যাই। তাহলে তো আর ওদের বাড়ি পৌঁছতে পারব না। রাস্তাতেই....।'

এসব শুনে টুপসির দুঃখ হয়। এমন যদি হত, সবগুলো ঢেবু, পেটু, ফুলু আর ওই খোকা খুকু, যাদের ও নাম দিয়েছে টুকু, টুলু, পুটু, কুটু, নুকু, এই মেমসাহেব নেলি, মিলি, সুসি, সোফি এদেরকেও—সব্বাইকে ওর কাছে রেখে দিতে পারত। এমনকি, ওই হি-ম্যান, স্পাইডারম্যান, ব্যাটমান, ফায়ারম্যান সুপারম্যান—ওদের কাউকেই ও কাছছাড়া করত না। একটা বড় ঘরে সবাইকে রেখে দিত। ওরা নিজেরা নিজেদের মতো খেলত। টুপসিও খেলত।

দোকানে ভিড় বিকেল থেকেই। টুপসি তাপুদার সাইকেল থেকে নেমে দোকানে ঢুকে একদম ভেতরের কোণে চলে যাবে। দোকানের মুখেই মামু বসে একটা উঁচু টুলের ওপর কাস্টমার সামলায়, টাকা পয়সার হিসেব করে। তাপুদা ফরমাশ মতো জিনিস বার করে এগিয়ে দেয়। সামনের দিকে ওই নেলি মিলি সোফিরা, কি সুন্দর না দেখতে! দেখলেই ইচ্ছে হবে কোলে তুলে আদর করি। তারপরে সাজানো টুকু টুলুরা, তার পাশে ঢেবু পেটুদের হল্লা গুল্লা। মামার পেছনে সব গাড়ি পিস্তল বন্দুক আর হি-ম্যানরা। টুপসি এসে মামু বয়াম খুলে দুটো লেমনড্রপ ওর হাতে গুঁজে দেবে। তার একটা ও খাবে, আরেকটা

রেখে দেবে বুল্টু সোনাভাইটার জন্যে। মামি রোজ বকবে—'এ সব ছাই- ভসমো খেলে অসুক করে, পেঁটে কেঁচো হয়—তবু এগুলোই খাবি।'

দোকানের একদম ভেতর দি-কটায় আছে অন্য খেলনা। মাটির চিনেমাটির হাতি-ঘোড়া, ফুল, ফুলদানি, পরী। এরা খুব ঠাণ্ডা পুতুল—কথাবার্তা মোটে নেই। কেউ ভারিমুখ, কেউ একটুখানি হাসি মুখে লাগিয়ে চুপচাপ। এখানেই পেয়েছিল লালচে মতো কাঠের বেড়াল—ছোট এটুকু একটা। দেখতে কিন্তু মজার। কালি মাখা বড় বড় চোখ, ল্যাজটি খাড়া আর সারা গায়ে চিতার মতো কালো কালো বুটি। মামু বলেছিল এগুলো নাকি কাশীর পুতুল। আগে অনেক ছিল। সব বিক্রি হয়ে শুধু ওই বেড়ালটা পড়ে আছে।

'কেন?'

—'কেউ নেয় নি ওটা।'

—'কেন? নেয়নি কেন?'

—'পছন্দ হয়নি।'

—'আমার খুব পছন্দ হয়েছে তো।' মামু আর কিছু বলে না। টুপসি দুটো আঙুল বাড়িয়ে ওটাকে আদর করতেই পড়ে গেল। এ ম্যা! একদম পলকা তো। আঙুল ঠেকাতেই পড়ে গেল! তা যাক। টুপসি ওর নাম রাখল 'পলু'। কেন যে 'পলু' তা বলতে পারব না। হয়তো পলকা বলে।

পলু টুপসির দারুন 'ফ্রেন্ড' হয়ে গেল। টুপসি দোকানে এসে মামুর হাত থেকে লজেন্স নিয়ে একদম ভেতরে চলে যাবে। তারপর পলুকে তাক থেকে নাবিয়ে ওই কোণায় বসে ও সঙ্গে গল্প সুরু করবে। পলু নাকি এ দোকানের সবচেয়ে পুরানো পুতুল। আলি আসগর নামে কে ছিল। এই সব মাটি, চিনেমাটি আর কাঠের খেলনা সবই ওর আনা। থলে ভর্তি করে আনত। সে সব পুতুলে এখন আর কে কিনতে চায়। তাই সে বুড়ো এখন আর আসে না।

আলি আসগরের বাড়ি ওই কাশী, নাকি বারানসী, তার বাড়ির সবাই এসব পুতুল বানায়। কত যে পুতুল- শিব পার্বতী, ঠাকুর দেবতা, কত রকম পাখি, বাঘ হাতি, বেড়াল, গরু—সব বলে শেষ করা যাবে না। হলে কি হবে। এখন কি আর সে সব ট্যারা বাঘ আর কেঠো হাতির পিঠে ঠুটো রাজার যুগ আছে? কেউ ফিরেও তাকায় না। সবাই খোঁজে ওই ঢেবু পেটু মিকি মিনি কিংবা সোফি, নেলিদের। এখন তো সবাই ইংলিশ মিডিয়মে পড়ে লেখে—সেখানে দিশি কিছু চলবে না। এত সব কথা, এর কোনটা ওকে তাপুদা বলেছে আর কোন কথাটা যে পলু বলেছে তা বলতে পারব না। তবে একটা কথা, পলুর মতো আরো একটা বেড়াল যে দোকানের কোথাও লুকিয়ে আছে, এটা তো মামু তাপুতা কেউই জানে না। এ

নিশ্চয় ওকে পলুই বলে থাকবে। হলই বা কাঠের বেড়াল, সেকি আর কথা বলতে পারে না?

তবে এটা শোনার পর থেকে টুপসির খোঁজা শুরু হয়ে গেছে। দোকানে ঠাসাঠাসি আলমারি, শো কেস, দেয়াল আলমারি। তাতে বোঝাই সব বাক্স, কৌটো, শিশি, বয়াম। একটা বাক্স বেরুচ্ছে তো ঠুস্‌ঠাস্ আরেকটা ঢোকাচ্ছে তাপুদা। পেছনে আরো একটা অন্ধকার ঘরে কত যে কাঠের আর কাগজের বাক্স। তার মধ্যেও নাকি অনেক পুতুল। কিন্তু ঘরটা শুধু যে অন্ধকার তাই নয়; ওখানে ইঁদুর আছে ছোট বড়, আছে কিলবিলে আরশোলা। টুপসি ঢুকবে না ওখানে কিছুতেই। শুধু তাপুদাকে রোজ জিগ্যেস করে, 'আজ পুতুল বার করবে না?'

—'দাঁড়াও। ব্যস্ত কোরো না। তাক খালি হোক আরেকটু।'

টুপসি এসে এখন আগে পলুকে একটা খেলনা কাপে মিছামিছি-দুধ খাওয়াবে। তারপর পলুকে নিয়ে ওই দিকের ওই নেলি লিসিদের থেকে এই পর্যন্ত সবগুলো তাকে সক্কলের খোঁজ নেবে। কে কে চলে গেছে, নতুন কে কোথায় এল। সেদিন দোকানে আসার একটু পরেই মা আর মামি বঙ্কুকে নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার? না, ওনারা বাজারে যাবেন। টুপসিকে নিয়ে গেল। বাজার ঘুরে যখন এল, দোকানে খুব ভিড়। সামনে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢোকা গেল না। পরদিন কী কান্ড! সেই রানি মেম নেই, রিনি নেই। গোলুরা কেউ নেই। ঢেবু মোটুদের তাক প্রায় খালি। একি! বড় রেলগাড়িটা নেই। লাল বড় মোটর-কারটাও নেই। খুব মন খারাপ হল টুপসির। কী যে সুন্দর ছিল রানিটা, না কি পাঁচশো টাকা দাম। নিয়ে গেল? দুঃখ হল রেলগাড়িটার জন্যেও। রোজ ওই রেলগাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কত যে খেলত, মনে মনে অবশ্য। পলুকে নিয়ে ওই গাড়িটা চড়ে বাড়ি যাচ্ছে। স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ও গরম চপ সিঙাড়া কিনে খাচ্ছে। ঢেবু ফুলুরাও সঙ্গে। সবাই মিলে কী হৈ চৈ! যাঃ, রেলগাড়িটাই নিয়ে গেল, তাপুদা বলেছে, কাদের নাকি জন্মদিন ছিল। অনেক লোক এসেছিল তাদের জন্যে প্রেজেন্টেশান কিনে কিনে তাক সব খালি করে দিয়েছে। তাপুদা হাসে—'কি, তোর মন খারাপ হয়ে গেল? বোকা মেয়ে! বিক্রি হলেই তো লাভ।' মামু বলেছে, 'আরো রানি নিয়ে আসবো। আরো রেলগাড়ি। কিচ্ছু ভাবিস না।'

—'কিন্তু কবে?'

—'এই শিগগিরি।'

পরে জানতে পেল। তাদেরকে মামু রাখতে যাবে, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। তখন দোকানের মাল ও কিনে আনবে। তাহলে? সেই রানি বা রেলগাড়ি কোনোটাই তো টুপসি দেখতে পাবে না। তা কী আর করা যাবে? মামু তো আর দুবার করে যেতে পারছে না।

সে দিনটাও তো এসে যাচ্ছে—তারা বাড়ি ফিরে যাবে। এরকম টবে টবে ফুল বাগান তো তাদের নেই। আর ওই পুতুলের দেশই ধরো। এ সব ছেড়ে যেতে কি একটুও ভালো লাগে? এখানে এই বঙ্কু সোনা ভাইটা সারাদিনই গায়ে গায়ে। ওই যে তাপুদা কত গল্পটল্প বলে। ওখানে কে আছে বলো? মা তাকে সক্কাল বেলা ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবে অপিসে। ইস্কুল ছুটি হবে সাড়ে বারোটায়। পাশের ঘরের কাজুমাসি, তার সঙ্গে ফিরবে। ফিরে চান খাওয়া ঘুম। (কাজুমাসিই ঘুম পাড়িয়ে যায়।) ঘুম থেকে উঠে হোমটাস্ক সারো। মা আসবে সন্ধ্যা হচ্ছে তখন। গা ধুয়ে চুল বেঁধে শাড়ি বদলে রান্না সেরে ঘরে যখন এল, ওর তো ঘুম পেয়ে গেছে। মা কিন্তু শুনবে না—'ইস্কুলের খাতা বার করো। হোমটাস্ক কোথায়? এসব কী করেছ? কিচ্ছু হয়নি। সব ফিরে করো।' যা যতই করো, চুল টানো কিংবা স্কেল পিট্টি করো, ঘুম কারো কথা শুনবে না। লিখতে গিয়ে লাইনের ওপর লাইন উঠে যাচ্ছে। গুণ ভাগের ছয় চার নয় টয় গুলো মিনি পুষি হয়ে খেলা করতে থাকে। খাবার সময় তো রোজই চোখ বুজে। কী খাচ্ছে কে জানে! মা বকে—বোধ হয় নিজের মনে, 'এ জ্বালা আর পারি না। গেল তো আমাকে নিয়ে গেল না কেন। একা আমি চাকরি করবো, সংসার করবো, মেয়েকে মানুষ করবো—সব আমি একা!'

তাই বাড়ি ফিরতে টুপসির একটুও ইচ্ছে নেই। ওখানে বঙ্কু তো যাবে না, টবের গাছ একটাও না। গাছের জায়গা কোথায়?'

এদিকে রোজই ভাবে মামু বলে বুঝি, 'বেড়ালটাকে আর তুলে রাখতে হবে না। বাড়ি নিয়ে যা।' নাঃ, বলছে না। পলু কিন্তু তাকে চোখ টিপছে, 'আরো একটা আছে। আছে অনেক আছে....'। কোথায় যে আছে!

কাল দুপুরে ট্রেন। ব্যাগ গোছানো চলছে। মা বলেছিল, 'আজ আর দোকানে গিয়ে কাজ নেই। আয়

আমার সঙ্গে গোছাবি।' ও কেঁদে কেটে চলে এল। দোকানে এসে সবে লজেন্স দুটো নিয়ে সেই কোণার টুলে গিয়ে বসেছে, এমনি সময় পেটমোটা গোবুটাকে দেয়াল তাক থেকে নামিয়ে বাক্সে পুরে দিচ্ছে তাপুদা, আর গোবুটা চিৎকার করে কাঁদছে। সে কান্না আমাদের টুপসি ছাড়া আর কেই বা শুনতে পায়! ওর জন্যে মন এমনি খারাপ হল। ও হয়তো বলেই ফেলত, 'না দেব না গোবুকে, আমার গোবুটা' বলতে আর পারল কই? মাঝ থেকে দুটো লজেন্সের একটা যে কোথায় পড়ে গেল। টুপসি অনেক খুঁজল। কিন্তু গায়ে লাগালাগি র‍্যাক আর শো-কেস-সবগুলো ঠাসা বাক্স কৌটো। এর মাঝে খোঁজা! টুপসি হাঁটু গেড়ে ওই র‍্যাকের নিচে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে থাকে—অতবড় গুলির মতো লজেন্সটা গেল কোথায়?—'কী খুঁজছিস রে ওখানে?' মামু জিগ্যেস করে।

—'আমার লজেন্সটা পড়ে গেছে।'

—'থাক্ থাক্। ও লজেন্স খেতে হবে না।'

কিন্তু ততক্ষণে টুপসি দুটো আলমারি জোড়ার পেছনে দুনিয়ার ধুলো ময়লা থেকে টেনে বার করেছে ছোট একটা বাক্স, তার পেছনে আরো একটা বাক্স, আরে এটা কী? পলু নাকি আরেকটা? এতধুলো লেগে আছে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। আরো বড় বাক্স একটা দেখতে পাচ্ছে টুপসি, কিন্তু বার করতে পারছে না। একটা বাক্স থেকে বেরোল্ ছোট রেলগাড়ি একটা—চাবি দেয়া। তবে চাবিতে চলবে কিনা সন্দেহ। নিশ্চয় ভেতরে সব মরচে ধরে আছে। আরেকটা পলুকে জল নেকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে—'আরি ব্বাঃ। একদম এই পলুটার জোড়া। ওর মুখটা ডানদিকে ঘোরানো, এরটা বাঁদিকে। সেইরকম কাজল মাখা চোখ, গায়ে বুটি, যা কখনো বাড়ির বেড়ালদের হয় না।

মামুর কাছে খুব বকা খেল তাপুদা। কারণ পাশের দোকান থেকে দীনুদাকে ডেকে একটা আলমারি একটু সরালেই তার পেছনে আরো দুটো বাক্স। একটা ডাক্তারি সেট, আরটা কিচেন সেট। কবে থেকে পেছন গলে পড়ে আছে! 'এত অসাবধান তুই! কত মাল যে এমন ফেলে দিয়েছিস পেছনে! আমি কোনো কিচ্ছু শুনবো না। পয়লার আগে সবকটা আলমারি সরিয়ে পেছন পরিষ্কার করে আমায় দেখাবি।' আসল মজা হল টুপসির লজেন্সটা কিন্তু আলমারির নিচে যায়নি। ওটা পড়েছিল টুলটার সামনে আর সেটা তুলে দিল অপুদাই।

একসঙ্গে দোকান অনেক লোক চলে এসেছে। মামু আর তাপুদাকে বেশি বকার সুযোগ পেল না। তাদের পেছনে বঙ্কুর হাত ধরে মা আর মাসি চলে এল। কাল টুপসিরা চলে যাবে। তাই কেনা কাটা। বঙ্কুর জন্যে ভারি সুন্দর দুটো স্যুট কিনেছে মা। মামু বলল, 'কি খামের খা পয়সা নষ্ট করেছিস! কদ্দিন পরবে এটা?'

মামি টুপসিকে নিয়ে গেল জামার দোকানে। একটা হলুদ লাল ঝালর দেয়া পোশাক হল টুপসির, যেমনটা ওই মেমপুতুল নেলির গায়ে। আলমারির পেছন থেকে আর কী কী বেরুল জানা হল না।

সকালে ঘুম ভাঙতে মনে পড়ল—আজ তো চলে যাওয়া! আর মনটা এমনি খারাপ হয়ে গেল যে জানালায় চকমকে রোদের দিন, সেই রোদে মেলে ধরা নিমডালে 'চোখ গেল' পাখির 'আহা-হা হা' চিৎকার, বঙ্কুর, 'দিজি' 'দিজি' আদর গলা ডাক, কোনো কিছুই আর ভালো লাগলো না। তেমনি চুপ করে শুয়েই রইল। এখানে সব এমনি থাকবে—এই গাছ পাখি বঙ্কু ফুল প্রজাপতি, ওই পুতুলের রাজ্য। শুধু টুপসিকে চলে যেতে হবে—ওই চড়াই পাখির খুপরিতে। কেউ যাবে না তার সঙ্গে। এমনকি, ওই পলুটা লেজ খাড়াটা, ওটাও দোকানের তাকে অমনি ভোম্বল হয়ে বসে থাকবে। ওর সঙ্গে কথাও বলবে না কেউ। ওকে দুধ ও খাওয়াবে না। ভাবতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

বঙ্কুটা পাজিটাই বুঝি মাকে ডেকে আনল। 'ওমা কি বোকা মেয়ে তুই! কাঁদছিস কেন?' মাসি এসে তাড়াতাড়ি কোলে নিয়েছে—'কাঁদিস না টুপুসোনা। এই দ্যাখে না, মামু তোর জন্য কত খেলনা এনেছে। বোকা নাকি? কাঁদছিস কেন? আবার আসবি তো। আরেকটু বড় হ। তারপরে তো তুই এখানেই থাকবি—এখানে ইস্কুলে ভর্তি হবি। ভাইবোন একসঙ্গে ইস্কুলে যাবি....'

এটা অবশ্যই সুখবর। ও এখানেই থাকবে, বঙ্কুকে নিয়ে ইস্কুলে যাবে। কান্না কমবেই তো। তবে কান্নাটা একদম হাসি হয়ে গেল ওই খেলনাগুলো দেখে। তার মধ্যে কালকের সেই রেলগাড়িটা (তেল চকচকে হয়েছে)। আছে একটা কিচেন সেট, একজোড়া খোকা খুকু আর সেই পলুদের জোড়া—কাজল মাথা চোখ, সাদা লাল, লেজ খাড়া, গায়ে কালো বুটি—যা তুমি বেড়ালদের গায়ে কোনো বাড়িতেই দেখতে পাবে না।

ছবি : রাহুল মজুমদার

গজাননের স্বপ্ন

শিবানী রায়চৌধুরী

লেখাপড়ায় মন তো কোনও লোকেরই থাকে না। তাই গজাননেরও ছিল না। তা এটা কী আর এমন দোষের কথা—গজানন ভেবেই পেত না। সবাই বলত, 'গজার কাপালখানা পাঁপড় ভাজা, নয়তো চুন-সুরকি। গজা পড়ার বই পড়ত না, হাতের লেখা করত না। কারও কথা শুনত না। খালি খেলত, আর পড়তে বসলে স্বপ্ন দেখত।

বর্ষাকালের দুপুরবেলা গজাকে অঙ্ক কষতে দিলে গজা পাটীগণিতের পাতা খুলে নৌকা করে ভাসিয়ে দিত। 'সহজ পাঠ'-এর পাতা দিয়ে ঠোঙা তৈরি করত। আর খাবার ইচ্ছে হলেই কলম চিবোত। রোজ সন্ধ্যেবেলায় গজা পড়তে বসত। পড়া তো আর হ'ত না। পড়তে বসলেই তার চোখের ওপর ভাসত—দু ঠ্যাঙের একটা লোক তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। তার গায়ে একটা নীল রঙের কোট মাথায় একটা গাধার টুপি, হাতে একটা তালপাতার ভেঁপু। লোকটার নাম খটাস। গজা ভেবেই পেত না এই লোকটাকে কার মতো দেখতে।

গজা কারও সঙ্গে লোকটার মিল খুঁজে পেত না। লোকটার কোটের পকেটে চকচকে ঝিনুক, লাল-নীল কাঁচের টুকরো আরও কী সব যেন থাকত। লোকটা মাঝেমাঝে তার হিসেব কষত আকাশে গোলাপী চক দিয়ে। গজা বুঝতেই পারত না যে ওই ঝিনুক আর কাঁচভাঙাগুলোর অত হিসেব রাখার কী আছে। ভাবখানা যেন ওর মধ্যে কত মণি-মানিক লুকিয়ে আছে। লোকটার

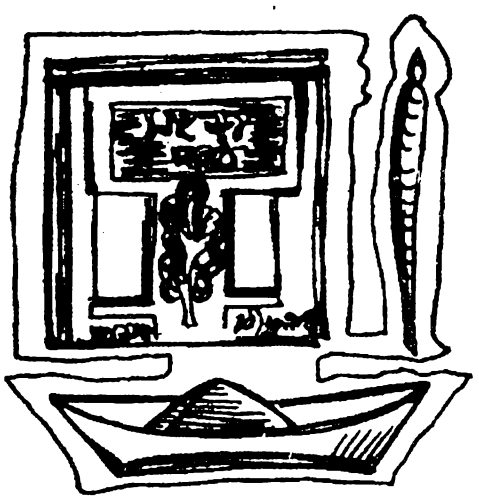

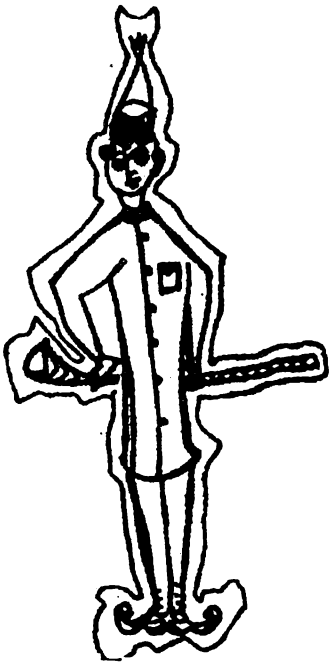

হাতের তালপাতার ভেঁপু থেকে সকালবেলা ঘুম-ভাঙানী সুর বাজত, আর সন্ধেবেলার ঘুম পাড়ানী। তাই সন্ধ্যে হতেই গজা ঘুমিয়ে পড়ত। গজার বাড়ির খিটখিটে লোক-গুলো কিছুতেই তার ঘুমের কারণ বিশ্বাস করতে চাইত না। তারা সব সময় গজাকে 'পড়তে বোস', 'পড়তে বোস' বলে লাফিয়ে উঠত। সেই লাফানি দেখে দাঁত-খিচুনি শুনে গজা পড়ার সময় পেত না। গজার আরেকটা মস্ত দোষ ছিল, সেটা হচ্ছে যেখানে সেখানে ছবি আঁকা। কারণ গজা ছবি আঁকতে খুব ভালবাসত। সে বাবার চেক বইতে গোলাপ ফুল এঁকে রাখত। ঘরের দেয়ালে বাড়ির লোকদের মুখ আঁকত। এমনকি দাদার অত শখের দামী সিল্কের জামাটায় ভূতের ছবি এঁকেছিল। তাই দেখে দাদা তো একেবারে খাপ্পা হয়ে গজাকে তাড়া করল। তারপর পিছলে পড়ে পা ভেঙে দাদা একটি মাস বিছানায় শুয়ে রইল।

গজানন ছবি আঁকত, খেলত আর স্বপ্ন দেখত। এখন এই গজাননের স্বপ্নের কথাই বলি। তা স্বপ্নগুলো সব তো আমার মনে নেই। আমাকে একটু স্বপ্ন দেখে দেখে বলতে হবে। গজাও লিখে রাখেনি। সে বলেছে স্বপ্নগুলা এমন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যে একজনকে লিখে রাখতে গেলে অন্যেরা ছুটে পালিয়ে যায়। স্বপ্নরা নাকি একটুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে শেখেনি। বোধহয় পাঠশালায় টাকওয়ালা মাস্টার-মশায়ের বেত খায়নি বলে। তবে স্বপ্নদের রাজা ঘুম-চাঁদ, যে কেবল ঘুমত আর নস্যি নিত। সে বলত, 'বেশি বাইরে থাকলে বাইরের জল হাওয়া লেগে স্বপ্নরা ঝাপসা হয়ে যায়। তাই ওদের সবটাতেই এত তাড়াতাড়ি। তাছাড়া ওরা হারিয়ে যেতে পারে, নয়তো সিনেমার লোকেরা বিনি পয়সায় ওদের ছবি তুলে বিক্রি করতে পারে। তাই আমি ওদের এত সাবধান করে দিই।

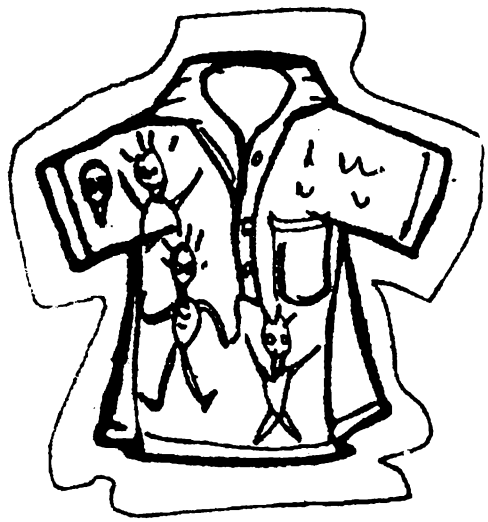

সেই স্বপ্নগুলোর কিছু কিছু লেখা ছিল গজার ছেঁড়া রাফ খাতায়। সেটা আবার গজার বাড়ির লোকেরা সের দরে বেচে দিয়েছিল। তারপর আমি একদিন মসলা মুড়ির ঠোঙায় লেখা দেখে আস্তে আস্তে স্বপ্নগুলো খুঁজে বের করি।

গজা লিখেছে—

একদিন সন্ধ্যেবেলায় :

খটখট্ শব্দ শোনা গেল। দেখি সবে পিসিমার শাঁখের আওয়াজ শেষ হতে না হতেই খটাস এসে হাজির। আর তার মুখ বড্ড ব্যাজার। কোটের বাঁ পকেট থেকে ভেঁপুটা বের করেই বাজাতে শুরু করল, যেই আমার ঘুম ঘুম আমেজ এসেছে অমনি রেখে দিয়ে ডান পকেট থেকে একটা ভাঙা টিনের স্লেট বের করে একমনে হিসেব কষতে লাগল। সেই দেখে আমি বললাম, 'খটাস, আজকে কি গল্প হবে না?'

খটাস খিঁচিয়ে উঠল, 'খালি গল্প গল্প করে কানটা ঝাঁঝরা করে

দিলে। এই বিপদের সময় কি গল্প আসে?'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'তোমার আবার কি বিপদ হলো খটাস?'

খটাস বলল, 'বিপদ বলে বিপদ, ছোট্ট বন্ধু পটাস হারিয়ে গেছে, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সব জায়গা খুঁজেছি— চিনির কৌটো, কেকের বাক্স, বিস্কুটের টিন, এমনকি জেলির শিশিতেও খুঁজেছি। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।'

আমি বললাম, 'ওকে ওখানে কি পাওয়া যাবে, তুমি পুলিশে খবর দাও না।'

খটাস গুম হয়ে বলল, 'পুলিসের কাজ এসব? যারা দিনরাত খাই-খাই করে পুলিশ তাদের কোথায় পাবে—বইয়ের ব্যাগে না পেন্সিলের বাক্সে?'

বুঝলাম খটাসের মেজাজখানা গরম। তাই আমি হাতের লেখা খাতা আর মোটা পাটীগণিতের ওপরে মাথাটা রেখে চোখ পিটপিট করতে লাগলাম। আর শুনতে পেলাম খটাস আপনমনে বিড় বিড় করে চলেছে—

(১) 'পটাসকে খুঁজে বের করতে হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন।

'নিরুদ্দেশ! নিরুদ্দেশ!

পটাস্! পটাস্! পাটাস্! ভাই ফিরে এসো! তোমার জন্য সন্দেশ, জিলিপি, পেঁয়াজি, ফুলুরি, ক্যাডবেরি সবই কেঁদে কেঁদে ফুরিয়ে যাচ্ছে। টাকার দরকার হলে তাড়াতাড়ি জানাও। খুব খিদে পেয়ে থাকলে বুকপোস্টে চলে এস।'

তোমার বন্ধু খটাস। কোলকেতা।'

(২) পটাসকে কেথায় কোথায় খুঁজে দেখব? চিনির বস্তা, খাবারের আলমারি, টিফিনবাক্স, রান্নাঘর... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, 'ওহো! ভুলে গেছি, পয়সার ব্যাগে লুকিয়ে থাকাও ওর একটা মস্ত দোষ।'

আমি তখন হিহি করে হেসে ফেলেছি। অমনি খটাস বলে উঠল, 'এই গজা, বড় যে হাসি মুখে। দাও তো দেখি সড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা এই গুণটা করে।'

আমি গুণ করার ভয়ে তাড়াতাড়ি কথাটা পাল্টে নিয়ে বললাম, 'পটাস কী করে হারাল বল তো?'

খটাস পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে চোখটা মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলল, 'আজ বিকেল বেলা আমি পটাসকে নিয়ে খেঁংরাপট্টিতে রথের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'রথের মেলায় তো লোক গিজগিজ করছে। প্যাঁ-প্যাঁ, ভ্যাঁ-ভ্যাঁ, কতরকমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছোট ছোট গালফোলা ছেলেরা বেলুন কিনছে, পুতুল কিনছে, কেউ নাগরদোলায় চড়বে বলে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে। সেই দেখে পটাসও বলতে লাগল, 'বেগুনি খাব, আলুকাবলি খাব।' সে সব তো খাওয়া হল। দু-তিনটে মাটির জগন্নাথও কেনা হল। নাগরদোলায় চড়া হল।

'বাড়ি ফিরছি যখন তখন মুষলধারে কী বৃষ্টি! ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্!

'এদিকে ঠাণ্ডা লাগলে পটাসের সর্দিজ্বর হতে পারে তাই ওকে তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরে ফেললাম।

'তারপর বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরতেই একসঙ্গে চিংড়ি, মট্‌কা ভেট্‌কি সবাই খোঁকিয়ে উঠল, 'পটাসকে কোথায় ফেললে?'

'আমি আর কিছুতেই তাকে খুঁজে পেলাম না। কত হিসেব কষলাম দেখলে তো?

'জগন্নাথকে দু-পয়সার বাতাসা দিলাম, বাতাসায় পিঁপড়ে ধরে গেল, কিন্তু পটাসকে পাওয়া গেল না। . . . এই বলে খটাস ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। একটুখানি কেঁদে আবার চুপ হয়ে বসে রইল।

আমি দ্বিতীয়ভাগের ভীষণ ঘোরালো প্যাঁচালো বানানের স্বপ্ন

দেখতে লাগলাম। কালকে এসব মুখস্ত না বলতে পারলে নির্ঘাৎ বেত খাব। অথচ এদিকে স্বপ্নের মধ্যে উ-কার, ঊ-কার, শ-ষ-স-ন-ণ নিজেদের ভেতর বেজা খটাখটি লাগিয়ে দিয়েছে।

জন্মদিনে দিয়েছিলাম।

তারপর আমিও হো হো করে হেসে উঠলাম ঘুমটাও ভেঙে গেল।

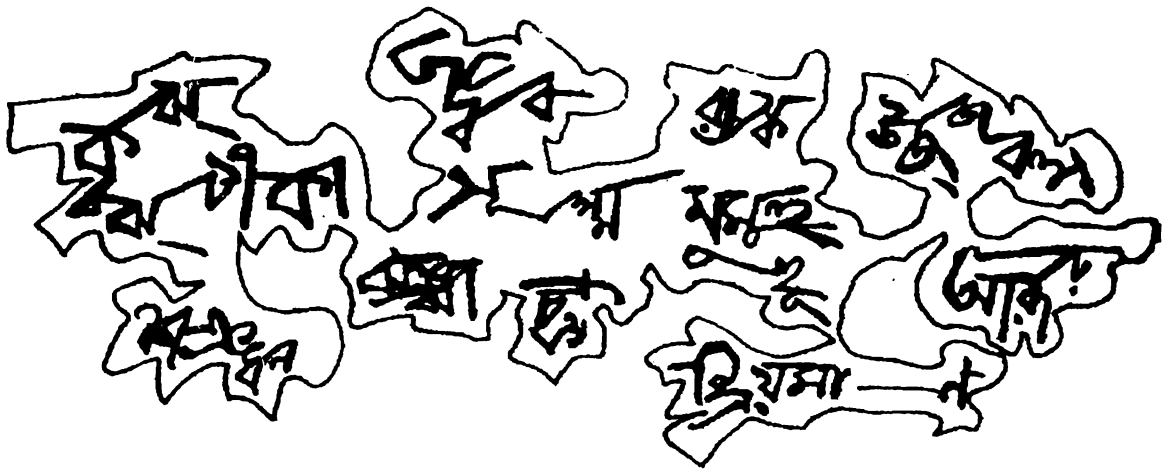

এমন সময় খটাস্ তড়াক করে লাফিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল—এই যা, বুক-পকেটটাই খুঁজে দেখিনি।

এই বলে তার প্যাটকা হাতটা বুক-পকেটে পুরে একটানে একটা নীল খাম বের করল।

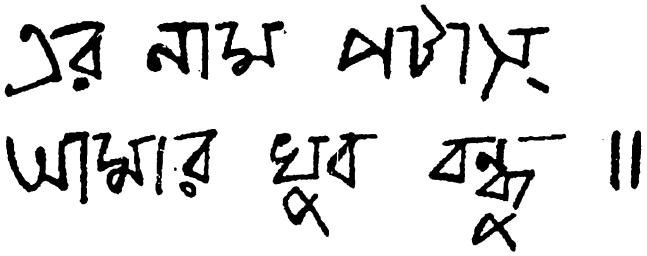

সেটা খুলে তার মধ্যে থেকে ব্লটিং-এ মোড়া একটা কাগজের ওপরে আঁকা চিহ্ন বের করল।

ভালো করে দেখি, ওমা ওটা যে আমারই আঁকা একটা ছবি! তার নিচে কে বাঁকাচোরা অক্ষরে লিখেছে—'এর নাম পটাস্।

আমার খুব বন্ধু।'

তখন আমারও মনে পড়ল যে এ ছবিটা তো আমি খটাসকে

*১৩৬৮-এর সন্দেশ থেকে পুনর্মুদ্রিত

ছবি : লেখক

কলকাতা, না কোলকাতা?

কয়েক বছর আগে সন্দেশ পত্রিকায় একটি 'গল্পসল্প'-তে উত্তর কলকাতার অর্ধ-শতাব্দী আগে উঠে যাওয়া ছোট রেলগাড়ির (বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে) গল্প করা হয়েছিল। তোমরা যারা একটু পুরানো গ্রাহক, তারা পড়েছ। তাতে কথা প্রসঙ্গে কলকাতা শহরের নামটির নানান বানান ও উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। চলতি ভাষায় কখনও লেখা হয়, কলকাতা, কখনও কোলকাতা (উচ্চারণ অবশ্য দুটোতেই—কোলকাতা)। আগে তো কলকেতাও লেখা হ'ত। ইংরাজিতে CALCUTTA, উচ্চারণ হয়, ক্যালকাটা। ফরাসিতে কালকুত্তা। (ভাগ্যিস শব্দটির এদেশীয় অর্থটা জানে না!) হিন্দীতে কলকেত্তা। ওড়িয়াতে ক-য়ের অ-কারান্ত উচ্চারণ করে ক-লিকাতা।

তাই সেই 'গল্পসল্প'-তে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সর্বজনীন ভাবে একই এবং স্থানীয় উচ্চারণ গ্রহণ করে রোমান অক্ষরে KOLKATA লেখা হোক।

তখন ভাবা যায়নি যে, কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার কিছু বিদগ্ধজন এই প্রস্তাব নিয়েই আন্দোলন করবেন এবং কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার সর্ব-সম্মতিক্রমে সেটা গ্রহণ করে সম্মতি দেবে। একুশ শতকের প্রথম দিন থেকেই (১-১-২০০১) KOLKATA চালু হল। যদিও বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন, সেরকম কলকাতার ক্ষেত্রেও অনেক সংস্থা বা পুরানো নামের সঙ্গে CALCUTTA-র স্মৃতি মিশে থাকবে।

এই নাম বদল বা নাম-সংস্কার নিয়ে কিছু মহল থেকে আপত্তিও উঠেছিল। তাঁদের যুক্তি ছিল, 'এই ভাবে ঐতিহাসিক নামের পরিবর্তন করা উচিত নয়। ইতিহাসকে তো মুছে ফেলা যায় না।' সত্যিই তা যায় না, সেটা ঠিক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই যেভাবে কলকাতার রাস্তাঘাট ও সংস্থার নাম বদল হতে লাগল, (বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসকের নামের সঙ্গে যা যুক্ত ছিল) তাতেও আপত্তি উঠেছিল। কিছু ভারতপ্রেমী ইংল্যাণ্ডবাসীরা অবশ্য ছাড় পেয়েছিলেন —যেমন, হেয়ার, বেথুন, বেনটিংক। অক্টোরলনি মনুমেন্টের নাম শহীদ মিনার করে কি স্তম্ভটির তৈরি হওয়ার পেছনে নেপাল জয়ের যে ইতিহাস ছিল, তাকে মুছে ফেলা গেল? লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগের মতো খারাপ কাজ করতে চেয়েছিলেন (সেই তো হলোই!) বলে তাঁর নামের পার্কটার নাম বদলানো হ'ল। তিনি নাকি কিছু ভালো কাজও করেছিলেন, পুরীর কোনারক মন্দিরগুলোর সংস্কারের ব্যাপারে। সেই পার্কটার নাম বদলানোর আগে তার বেশির ভাগ অংশ কেটে অন্য কাজে লাগানো হ'ল। তাই সুরেন্দ্রনাথ পার্ককে ঠিক আগের কার্জন পার্ক বলা যায় না। তাছাড়া যে সব নামের সঙ্গে কোনও ব্রিটিশ শাসকের নাম জড়িত নেই, সেই রাস্তাগুলোর নাম বদলেও অনেকে আপত্তি জানিয়েছিলেন। যেমন, সার্কুলার রোড, ধর্মতলা স্ট্রিট, চিৎপুর রোড, বহুবাজার স্ট্রিট ইত্যাদি।

কিন্তু KOLKATA নামকরণের ব্যাপারটির সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীর অনেক দেশ ও শহরেরই স্থানীয় নামকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন নামকরণ হয়েছে। বিশেষতঃ যাদের সঙ্গে অধীনতার গন্ধ লেগে ছিল। ভারতেরই অনেক শহরের নাম বদলেছে। চার মহানগরীর মধ্যে দুটিরই তো নাম পরিবর্তন হয়েছে আগেই। বাংলাদেশের রাজধানীর ইংরাজি নামও তো ডাক্কার বদলে ঢাকা হয়েছে। তবে কলকাতার ক্ষেত্রেই আপত্তি কেন? যতই হোক, কলকাতা নাম তো ক্যালকাটার চাইতেও পুরানো। তাই কলকাতা থাক KOLKATA-তেই।

কিন্তু বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এখনও একটু কিন্তু আছে। উচ্চারণের নিখুঁততার জন্য হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা হবে—'কোলকাতা'। সেক্ষেত্রে বাংলায় আলাদা ভাবে 'কলকাতা' কেন?' কলকাতার নামকরণের পেছনে অনেকগুলি মত আছে। তার একটি হ'ল, এখানে কলিচুনের ব্যবসা-বাণিজ্য হ'ত। কলি-চুনের 'কলি'-কে ফুলের কলির মতোই উচ্চারণ করি, 'কোলি'।

নইলে পলতা, ফলতা থেকে জলঢাকা, নলহাটি, খড়দহ— কোনোটাতেই তো প্রথম অক্ষর ও-কারান্ত উচ্চারণ করি না। যেখানে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত নেই, সেখানে অবশ্য করি — যেমন, বড়িষা, গড়িয়া। হয়তো কলিকাতা মূল নাম বলেই এই ও-কার।

তাই বুনো রামনাথের মত হ'ল, সর্বভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে বাংলা নামের বানানও হোক— 'কোলকাতা'। কোথায় যেন পড়েছিলাম।

কোলকাতা। কোলকাতা!
এই শহরে সবার তরে
আছে রে ভাই কোল পাতা।

ট্যান্টালাম্

সুইডিশ রসায়নবিদ আঁদ্রে একবার্গ ১৮০২ সালে একটি নতুন ধাতুর অক্সাইড আবিষ্কার করেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ধাতুটিকে নিষ্কাশন করতে পারেন না। গ্রীক পুরাণের রাজা ট্যান্টালাসের নামে তিনি ধাতুটির নাম দেন ট্যান্টালাম। (সেই গল্পে রাজা ট্যান্টালাস দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে, তাঁদের খুশি করা জন্য নিজের ছেলেকে মেরে তার মাংস দেবতাদের খাওয়ান। দেবতারা এই নৃশংসতার কথা জানতে পেরে প্রচণ্ড চটে অভিশাপ দেন যে সারা জীবন ট্যান্টালাস ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত হবেন, কিন্তু কখনও কিছু খেতে বা পান করতে পারবেন না।)

১৮০১ সালে 'কলম্বিয়াম' ধাতু আবিষ্কার হয়েছিল। মনে করা হয় তাহলে ট্যান্টালাম ও কলম্বিয়াম বোধহয় একই ধাতু। পরে ১৮৪৪এ কিন্তু প্রমাণ হয় যে কলম্বিয়াম একটি আলাদা ধাতু। প্রথম দেখা যায় এই ধাতুর গুণাগুণ ট্যান্টালামের মতোই, এর নাম হয় নায়োবিয়াম।

এই দুই ধাতুকে আলাদা করা এত শক্ত যে এক শতাব্দীর প্রচেষ্টার পর শেষে ১৯০৩ সালে প্রথম বিশুদ্ধ ট্যান্টালাম ধাতু তৈরি হয়। ট্যান্টালাম গলে ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়, তাই প্রথমে ট্যান্টালামের তার দিয়ে আলোর বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরি করা যায়।

কোনও কড়া অ্যাসিড বা রাসায়নিক পদার্থে ট্যান্টালামের ক্ষয় হয় না বললেই চলে, এক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বাদে। তাই ১৯৩০ থেকে বিভিন্ন অ্যাসিড, ব্রোমিন, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানার যন্ত্রাংশে ট্যান্টালাম্ ব্যবহার করা হয়। সোনা ও রূপো নিষ্কাশনের বৈদ্যুতিক (ইলেক্ট্রোলিসিস) প্রক্রিয়াতে ট্যান্টালামের পাতের ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। গাড়ির টায়ার ইত্যাদির কাঁচামাল কৃত্রিম রাবার বানাতেও ট্যান্টালাম্ ক্যাটালিস্ট ব্যবহার হয়।

ইস্পাতকে অপেক্ষাকৃত তাপরোধক ও ক্ষয়রোধক করতে লোহার সঙ্গে ট্যান্টালাম যোগ করা হয়। প্রচণ্ড তাপ সহ্য করার জন্য সুপারসনিক প্লেনের এঞ্জিনের ও রকেট এঞ্জিনের অক্সস্টনজল্ এবং নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরের কিছু যন্ত্রাংশ ট্যান্টালাম অ্যালয় দিয়ে তৈরি করা হয়। আরও বেশি তাপরোধক করতে এর ওপর আবার ট্যান্টালাম্ কার্বাইডের আচ্ছাদন থাকলে তা ৩,৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে কিছু সময়ের জন্য। ট্যান্টালাম কার্বাইড আবার প্রায় হীরের সমান কঠিন। তাই এর ব্যবহার আছে কারখানার 'মেশিন টুল'-এর ধাতু কাটার ব্লেড বানাতে।

রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলে মানুষের শরীরের মধ্যে ট্যান্টালাম্ ধাতু থাকলে কোনও খারাপ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। শরীরের মেরামতিতে একে ব্যবহার করা যায় নির্ভয়ে। মাথার খুলি খারাপ-ভাবে ফেটে গেলে অস্ত্রপচার করে ট্যান্টালামের পাত দিয়ে তাপ্পি মারা হয়। পেশি, টেন্ডন বা লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে ট্যান্টালামের সরু তার দিয়ে মেরামতি করা হয়।

ফাউন্টেন পেনের নিচের মাথায় থাকে ট্যান্টালাম্ ধাতুর ছোট্ট একটা গুলি (বেশি দামের কলমে অবশ্য থাকে ইরিডিয়াম্)। ট্যান্টালাম্ দেখতে সুন্দর, সোনা-রূপোর চেয়ে অনেক বেশি টেকসই, অথচ সোনা বা প্ল্যাটিনামের চেয়ে বেশ কিছুটা সস্তা। তাই দামী ঘড়ির কেসিং ও ব্যান্ড বানাতে এবং আধুনিক গয়নায় ট্যান্টালাম ব্যবহার হয়। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্সে ট্যান্টালাম্ ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর যন্ত্রাংশের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। আধুনিক ক্যামেরার লেন্সের কাচের প্রতিসরণ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য কাচের সঙ্গে ট্যান্টালাম্ পেন্টোক্সাইড যোগ করা হয়।

শৈলেনকুমার দত্ত

আজ রবিবার পৌরসভার ভোট! গত একমাস যাবৎ যে তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা, আজ তার পরিসমাপ্তি। ক'দিন ধরে পাড়ার ছেলেদের চোখে ঘুম নেই। পোস্টার ফেস্টুনের ছয়লাপ। এও যেন একটা উৎসাহ। বংশীদাদের রকের আড্ডায় প্রতিদিন যত ছেলে জমা হয়, তারাও তিন দলে ভাগ হয়ে গেছে। সারা মাসে আড্ডাও তেমন জমেনি। দু'-চার জন আবার রাজনীতিতে বিশেষ জড়ায়নি, তাদের নিয়েই সময় কেটেছে। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য সেই ভোট।

পাড়ার যারা ভোটের প্রার্থী, তাদের মধ্যে বাপ্পা, সঞ্জয় এবং অরূপবাবুও আছেন। তারা সবাই বাড়ি বাড়ি এসে ভোট প্রার্থনা করে গেছে, তাদের সাঙ্গপাঙ্গরাও ভোটের কাগজ দিয়ে গেছে। সব আয়োজনই সম্পূর্ণ, অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি নেই।

বংশীদাদের রকে একা বসে আছে ঘনামামা। সকাল থেকে একলা পাহারাদার। পাড়া জুড়ে একটা যেন সাজ-সাজ রব। মেয়ে-বউরা তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়েছে সকাল সকাল ভোট দিতে যাবে বলে। সকাল সাতটা থেকে ভোট। কেউ কেউ তাই ভোট দিয়েই বাজারে যাচ্ছে।

বেলা ন'টা বাজতেই পাড়া একেবারে খাঁ খাঁ। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে। ঘনামামাকে একা বসে থাকতে দেখে কালু বলল, 'কি গো তুমি এখনও এখানে বসে আছ? ভোট দিয়ে যাওনি?'

ঘনামামা শান্তভাবে মাথা নাড়ল। কালুর পিছন পিছন আসছিলেন বৃন্দাবনবাবু, তিনি বললেন, 'দেরি করে গেলে আর ভোট দিতে পারবে না। তোমার হয়ে অন্য কেউ দিয়ে দেবে।'

সে আবার কী কথা! এই ব্যাপারটা ঘনামামা ঠিক বুঝতে পারেন না। পাড়ার সবাই সবাইকে চেনে, এখানে একে অপরের ভোট দিয়ে দেবার প্রশ্ন আসে কী করে!

তবু ঘনামামা নিজের সিদ্ধান্তে অটল। স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে ভোট দিতে যাবেন। ভোট তো সেই তিনটে পর্যন্ত, এত তাড়ার কী আছে?

পাড়ার ছেলেরা যারা ভোটের কাজকর্ম করে তারা সবাই ঘনামামাকে চেনে। তারাই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এক একজন প্রার্থীর প্রতিনিধি। সে জন্যে ঘনামামা কিছুটা নিশ্চিন্ত, তাঁর ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিতে পারবে না।

রাস্তা দিয়ে পাড়ার ক'টি অল্পবয়সী মেয়ে ভোট দিয়ে ফিরছিল।

এবারই প্রথম ভোট দিয়েছে। আঙুলে কালির দাগ নিয়ে খুব হাসিঠাট্টা চলছিল তাদের মধ্যে। ঘনামামার দিকে তাকিয়ে ডলি জিজ্ঞেস করল, 'কি গো ঘনামামা, ভোট দেবে না?'

ঘনামামা হাসলেন, 'হ্যাঁ ভোট দেব না আবার। তোরা এখন দিয়ে এলি, আমি যাব দুপুরবেলা। খাওয়া দাওয়া সেরে।'

মেয়েদের মধ্যে ঘনামামার আপন ভাগ্নী রমাও ছিল। সে বলল, 'মামা, খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে তবে যাবে। অবশ্য ঘুম ভাঙলে। যদি ঘুম না ভাঙলে তাহলে ভোট দেওয়াও হবে না।'

আবার একটা হাসির রোল উঠল।

ঘনামামা একটু ঘুম কাতুরে বলে পাড়ার সকলেই হাসিঠাট্টা করে। এতে ঘনামামা একদম রাগ করেন না। লোকে চার বেলা খায়। তিনি না হয় চার বেলা ঘুমোন, এই যা তফাৎ।

ভাগ্নীর দল চলে যেতে এল গোবর্ধন ডাক্তার। ঘনামামাকে দেখে বলেন, 'কি গো ঘনশ্যাম, ভোট দিতে গেছিলে?'

ঘনামামা না বলাতে গোবর্ধনবাবু তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'যাও যাও ভোট দিয়ে এস। এগারোটা তো বেজে গেল।'

এগারোটা বেজে গেছে শুনে ঘনামামা উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়াটা সেরে নিই, তার পরেই যাব।' বলতে বলতে তিনি রক থেকে উঠে পড়লেন।

এমনিতে ঘনামামা খুব শান্ত প্রকৃতির, ঢিলেঢালা মানুষ। স্নান খাওয়ার পর্ব মিটতেই একটা বেজে গেল। তারপর ধুতিপাঞ্জাবি পরে যখন ভোট দেবার জন্য রওনা হন তখন প্রায় দেড়টা।

ঘামতে ঘামতে ভোট কেন্দ্রে যখন পৌঁছলেন তখন বিশাল লম্বা লাইন। বাইরে থেকে কে একজন বলল, 'একটু আগে একদম ফাঁকা ছিল। খাওয়াদাওয়ার পর এক সঙ্গে সকলে আসছে, ভিড় তো একটু হবেই।' অগত্যা দাঁড়াতেই হ'ল লাইনে।

ঘনামামার সামনে জনা তিরিশেক লোক। তারপর পাশেই আছে মেয়েদের আলাদা লাইন। সেখানেও ভিড় মন্দ নয়। তার মানে এদিক থেকে একজন ওদিক থেকে একজন ভোট দিলে তাঁর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনের পিছনে। তিনি নিঃশব্দে লাইনে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই গরমে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো।

কিন্তু ভোট দিতে এত দেরি হচ্ছিল যে এক একজনের পর্ব মিটতেই প্রায় দু'-আড়াই মিনিট সময় লাগছে। তবু চুপচাপ থাকলেও সময় কিছুটা কম লাগে, কিন্তু লাইনের কিছু ভোটার এত চেঁচামেচি করছিল যে অযথা বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হ'ল।

একে চড়া রোদ, তারওপর এইসব ছুটকো ঝামেলা। ঘনামামা মনে মনে একটা হিসেব করে ফেললেন, তারপর সামনে পিছনের লোককে বলে লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দু'জনেই তাঁর খুব কাছের লোক, তারা কোনও আপত্তি করল না।

লাইনে থেকে বেরিয়ে এসে ঘনামামা পাশের মদনমোহন মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানেও রোদ একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করছে। অবশ্য ওপাশে আচায্যি পুকুরের পাড়ে বিশাল কদম গাছের তলাটা খুব ঠাণ্ডা। একটু নিরিবিলিও আছে। তিনি পায়ে পায়ে ওদিকে এগিয়ে গেলেন।

পুকুরপাড়ে গাছ তলাটায় বসে ঘনামামার খুব ভালো লাগল। কয়েকটা ছেলে পুকুরে চান করছিল। তাদের দেখে ঘনামামার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। কী জলই না ঘাঁটতেন এই পুকুরে! তখন পুকুরটাও ছিল পরিষ্কার আর পাড়ে গাছও ছিল অনেক বেশি।

পুকুরের ওপর থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত এসে আছড়ে পড়ল ঘনামামার চোখেমুখে। যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অন্যদিন হলে ঘুমকাতুরে ঘনামামা এতেই কাবু হয়ে যেতেন। কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। আজ ভোট দিতে এসেছেন, সময়ের ব্যাপার আছে, কিছুটা নাগরিক দায়িত্বও।

বসে বসে ঘনামামা আবিষ্টের মতো একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। গরমে হল্কার মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়াটা বড় ভালো লাগছিল তাঁর। একভাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

এক মিনিট... দু'মিনিট... তিন মিনিট... চার মিনিট— বেশ চলছিল ঘড়ির কাঁটা। কিন্তু দেখার লোকটির ঘাড় হঠাৎ ঝুলে পড়ল বুকে। ভোট দেবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞাও সেটা আটকাতে পারল না।

হঠাৎ ঘুমে ভেঙে গেল ঘনামামার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন পৌনে চারটে। নিজেকে খুব বিব্রত মনে হল। এত করে জেগে থাকার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল শেষ পর্যন্ত। ভোট না দিয়ে বাড়ি ফিরলে আর রক্ষে আছে! ভাগ্নে-ভাগ্নীরা তো খেয়ে ফেলবে।

ঘনামামা এককালে ভোটের ডিউটি করেছেন, হঠাৎ মনে পড়ল ভোটদানের শেষ পর্বের পদ্ধতিটা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে পারলে সকলেই ভোট দিতে পারবে। তা সে যটাই বাজুক না কেন। আর ঘনামামা যে ঠিক সময় পৌঁছেছেন তার সাক্ষীও আছে।

এসব ভেবে তিনি হনহন করে ভোটকেন্দ্রে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু কোথায় কে! ভোটা কেন্দ্রের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এই বন্ধ যে কোনওভাবেই খোলা যায় না, তা তিনি জানেন।

ভোট না দিলে আর কী এমন ক্ষতি হয়! কিন্তু ঘনামামা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে এদিকওদিক ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিলেন। যদি পাড়ার কোনও ছেলেকে দেখতে পান। কিন্তু না, যে ক'জন ভোটের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত সেই পোলিং এজেন্টরা কেউ এখনও বেরোয়নি। ব্যালট পেপারা অ্যাকাউন্টের কপি নিয়ে বোধহয় বেরোবে।

ঘনামামা একটু যেন আশ্বস্ত বোধ করলেন। সোজা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন দরজার সামনে। প্রহরারত পুলিসেরা সন্দেহ প্রকাশ

করলেও শেষ পর্যন্ত কিছু বললেন না।

প্রায় ঘন্টা খানেক পরে ভোটকেন্দ্রের দরজা খুলে প্রথম বেরিয়ে এল সন্তু, এবার সঞ্জয়ের এজেন্ট হয়েছে। ছেলে হিসেবে খুবই ভালো। ঘর থেকে বেরিয়েই ঘনামামাকে দেখতে পেয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

পুলিসদের সামনে ঘনামামা কোনও কথা বললেন না। সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে আসেন। সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে দেখলাম না তো? তুমি ভোট দাওনি?'

'না।' ঘনামামা একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'সেই জন্যেই তো তোকে খুঁজছি।'

'আমাকে খুঁজলে কী হবে? তোমাকে এখন ভোট দিতে দেবে?' ঘনামামার অভিপ্রায়টা না বুঝে সন্তু উষ্মা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘনামামা বললেন, 'না রে বাবা, ভোট যে দিতে দেবে না তা কি আমি জানি না! আমার শুধু একটা কালির ফোঁটা লাগবে আঙুলে।'

সন্তু বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

এবার গলার স্বরটা একটু নামালেন, 'আসলে জানিস তো, বাড়ি ফিরলে সবাই ছুটে আসবে আঙুলের দাগ দেখতে। কালির দাগ না থাকলে আর রেহাই আছে!'

সন্তু এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হোহো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'মজার ব্যাপার তো! কেউ কেউ ভোট দিয়েও কালির দাগ তুলে ফেলার চেষ্টা করে, আর তুমি ভোট না দিয়েও কালির দাগ চাইছ! এট অবশ্য অপরাধ না হওয়ারই কথা, তবু একবার প্রিসাইডিং অফিসারকে বলে দেখি—'

ঘনামামা সন্তু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'না না, তাঁকে আবার বলার কী দরকার! তুই চুপিচুপি এক ফোঁটা কালি লাগিয়ে দে না।'

সন্তু পুলিস দু'জনকে কী বলে ভেতরে ঢুকল ও একটু পরেই কালির শিশি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর সত্যি সত্যিই ঘনামামার বাম তর্জনীতে এক ফোঁটা লাগিয়ে দিল। ঘনামামা খুব খুশি। আঙুলটা হাওয়ায় শুকোতে শুকোতে বাড়ি ফিরলেন।

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের তখনকার মতো চাপা দেওয়া গেলেও পাড়ার ছেলেরা কিন্তু সব জানল। ভোটের ফল বেরোবার আগেই তাই বংশীদাদের রকে আড্ডা মুখর হয়ে উঠল নতুন স্লোগানে—'আসলে ভোট দিল কে? ঘনামামা আবার কে?'

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

ছোঁয়াচ

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্ল্যাটবাড়ি বিশতল
ট্যাকে গুঁজে পিস্তল
জেল ফেরা ঝানু দাগী সর্দার
দুপুরেতে শুনশান
কানদুটো টান টান
উঁকি দ্যায় ফাঁক দিয়ে পর্দার।
নিরিবিলি ভাত ঘুম
ফ্ল্যাটবাড়ি নিঝঝুম—
মোলায়েম গদি আঁটা শয্যায়
চোখ তার পরে আর
রাতজাগা দেহে তার
ঘুম নামে অস্থি ও মজ্জায়।
আর কি সে খাড়া রয়,
অকাতরে নির্ভয়
শুয়ে যেই পড়ে সেই ডাকে নাক।

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

স্বীকারোক্তি

সায়নী দাশ

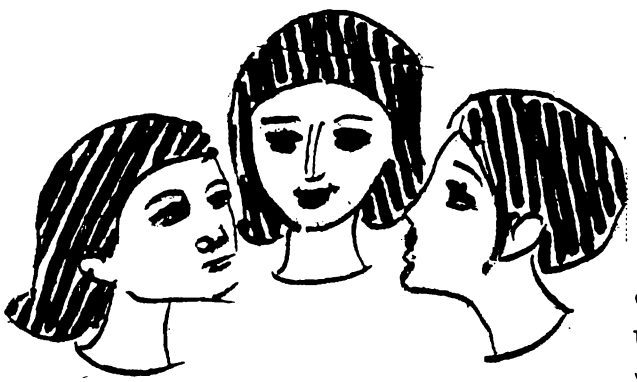

অনেক দিন/বুদ্ধুমামা এসে হাজির।

'হ্যাঁ বুদ্ধুমামা, একটা গল্প বলো না। চোরের গল্প,' মামাই বলে।

'চোরের গল্প শুনবি? তা চোর মানে জানিস তো?'

'সে তো সবাই জানে। যারা চুরি করে তাদের বলে চোর' চটপট উত্তর দিয়ে দেয় টুকাই।

'ঠিক আছে। আজ চোরের গল্পোই শোনাব তোদের। কিন্তু একটা শর্ত আছে।' বুদ্ধমামা মুচকি হাসে।

'কী শর্ত?' তিনজনই একসঙ্গে জানতে চায়।

'এ পর্যন্ত তোরা যেসব ছুটকো-ছাটকা চুরিটুরি করেছিস তার মধ্যে থেকে একটা ঘটনা আমার কাছে বলতে হবে। অর্থাৎ তোদের স্বীকারোক্তি চাই।'

'এ তুমি কী বলছো বুদ্ধমামা? আমরা চুরি করতে যাব কোন দুঃখে?' হাউমাউ করে উঠল তোতন।

'রাগ করিস কেন? শোন, অভাবে যে স্বভাব নষ্ট হয়, এটা সবাই জানে। তখন মানুষ চুরি করে, অর্থাৎ না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে নিজের অভাব মেটানোর চেষ্টা করে। এ ছাড়া আরও এক ধরনের মানুষ থাকে। তারা ক্লিপটোম্যানিয়া বলে একরকম মনের অসুখে ভোগে। তাদের হয়তো পাঁচটা পেন, দুটো ঘড়ি আছে, অথচ বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি গেলে ওইসব জিনিস দেখলেই তুলে নেওয়ার জন্য হাত নিসপিস করে। পাকা চোরের মতো তুলেও আনে।'

'ও মা, একি অনাছিষ্টি কান্ড!' রাঙাদিদার মতো গালে হাত দিয়ে ঘাড় কাত করে মামাই।

'তোদের মধ্যে কারও সে রোগ নেই আশা করি। থাকলে, এতদিনে ঠিক টের পাওয়া যেত।' বুদ্ধমামা মিটিমিটি হাসে।

'আজেবাজে কথা বাদ দিয়ে তোমার গল্পটা শুরু করে দাও না।' তাড়া দেয় তোতন। গল্প শুরু করার আগে বুদ্ধুমামার এই ধানাই-পানাই কোনোদিনই পছন্দ হয় না তার।

'না, না, আমার শর্ত পুরণ না হলে এখানে আর এক মুহুর্তও থাকছি না। যাই ছোড়দির হাতের এক কাপ চা খেয়ে কেটে পড়ি।' বুদ্ধুমামা দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

তিনজন তিনদিক দিয়ে থেকে বুদ্ধুমামাকে জড়িয়ে ধরে, 'না। তুমি যেও না। দাঁড়াও মনে করার চেষ্টা করছি। একটু বসে যাওয়া না প্লীজ।'

অগত্যা বুদ্ধুমামাকে খাটের ওপর বসে বড়তে হয়। তাকে ঘিরে তিনজন এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসি।

'নাঃ, আমার তো তেমন কোনও ঘটনা মনে পড়ছে না।' মাথা চুলকোয় টুকাই।

'তবে তুই এ ঘর থেকে চলে যা। দরজা বন্ধ করে আমি

এদের দুজনকে গল্প শোনাচ্ছি।'

'ওঃ, দাঁড়াও না। একটু একটু যেন মনে পড়ছে। অনেক দিন আগেকার কথা। তখন আমি খুব ছোট।'

'এখন বুঝি খুব লায়েক হয়েছ?' টুকাইর মাথায় আলতো করে টোকা দেয় বুদ্ধুমামা।

'এবার তো ক্লাস সেভেন উঠেছি। তখন সবে ক্লাস টু।'

'চটপট ঘটনাটা বলে ফ্যালো তো।'

'ভাত খেয়ে রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় টিফিন নিয়ে যাই। লুচি আলুর দম, ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, ফল, এই সব। রোজই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই ধরনের খাবার। সক্কলেরই। একঘেয়ে।

'মাস দুয়েক পর আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে নতুন ভর্তি হল। তার টিফিনের বহর দেখে আমরা তো থ। ফিস ফ্রাই, মাংসের চপ, পেস্ট্রি, এই সব। নিত্য নতুন। সবগুলোর নামও জানি না। ছোট্ট একটা ফ্লাস্কে করে একদিন একটা আইসক্রিমও নিয়ে এসেছিল।

'খাবারগুলোর দিকে চেয়ে আমাদের চোখের পলক পড়ে না। হাতের লুচি আলুর দম হাতেই রয়ে যায়।'

'তারপর?'

'তারপর তোমার আর কী বলব, একদিন আর পারলাম না। খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেললাম। বিশ্বাস করো, জীবনে সেই প্রথম আর শেষ।' মাথা নিচু করে টুকাই। তার গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা।

'কাজটা কী, বলবি তো?' টুকাইর কাছে সরে এল বুদ্ধুমামা।

ভাঙা ভাঙা গলায়ই শুরু করে দিল টুকাই, 'একদিন, রাজেশ, মানে এই নতুন ছেলেটা টিফিন টাইমে সবে টিফিন বক্স খুলেছে, বারান্দা থেকে গনপতিদা হাঁক দিল, 'ইখানে রাজেশ গুপ্তা কে আছেন? অফিসঘরে উনার বাবা আসিয়েছেন, দেখা করতে। দিদিমণি বুলাচ্ছেন জলদি যাও।' টিফিনবক্স খুলে রেখেই ছুট দিয়েছে রাজেশ। অন্য ছেলেরাও হুড়মুড় করে, যে যার টিফিন খেয়ে খেলার মাঠে চলে গেল। আমিই শুধু রাজেশের টিফিনের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি।

'হাতটা হঠাৎ কেমন নিসপিস করে উঠল। কখন কেমন করে ওর পেস্ট্রিটা যে তুলে নিয়েছি নিজেই বুঝতে পারিনি।

'পাড়ার দোকান থেকে মা সেদিন একটা ছোট্ট পেস্ট্রি কিনে দিয়েছিল। রাজেশের টিফিনবক্সে সেটা রাখতে গিয়ে দেখি, হাতটা ঠকঠক করে কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

'ব্যাপারটা রাজেশ তো খেয়ালেই করেনি। কিন্তু সেইদিন থেকে কী যে হল, ওকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে কী যেন একটা হাত থাকে। ওর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতেই পারি না। এটা ভয় না লজ্জা না অন্য কিছু আমি জানি না।'

'একেই বলে অনুতাপ, বুঝলি?' টুকাইর পিঠে আলতো করে হাত রাখে বুদ্ধুমামা, 'যাক, একবার যখন অনুতাপের যন্ত্রণা ভোগ করেছিস। আশা করি ভবিষ্যতে এমন কাজ করার প্রবৃত্তি আর কোনোদিন হবে না।'

'এই নাক কান মলেছি বুদ্ধুমামা।' সত্যিই সত্যিই কানে হাত দেয় টুকাই।

দূর পাগল ছেলে। এত ভেঙে পড়ছিস কেন? আমি শুধু ভাবছি এই ঘটনার জন্য আর একজনও তো দায়ী। তারও কি কোনোদিন অনুতাপ হবে? নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করবে?

'সে কে বুদ্ধুমামা?' জানতে চায় মামাই।

'রাজেশের মা। তিনি যদি নিজের ছেলেকে বাড়িতে কোলের কাছে বসিয়ে ওই সব ভালোমন্দ খাওয়াতেন, আর স্কুলে অন্য বাচ্চারা কেমন খাবার দিয়ে যায় তার খবর রাখতেন, বেচারা টুকাইকে এমন অনুতাপের জ্বালায় জ্বলতে হত না। কবে যে এরা বুঝবে?'

'ঠিক বলেছ বুদ্ধুমামা, বড়রা কিছুই বোঝে না।' মামাই বলল।

এবার তোতনের পালা। সবাই তোতনের দিকে তাকায়।

'বলব?' ইতস্তত করে তোতন।

'না বলতে চাইলে বাইরে যাও।' বুদ্ধুমামার সেই এক কথা।

'বলছি বলছি। আমাকেও বাড়ি থেকে টিফিন বক্স ভর্তি করে খাবার দেয়। খাতা পেনসিল খেলার জিনিস, গল্পের বই, যখন যা দরকার হয়, কিনে দেয়। কিন্তু কোনোদিন টাকা পয়সা হাতে দেয় না।

'আমাদের ক্লাসের বিল্টুর মা তো মস্ত চাকরি করেন। রোজই স্কুলে আসার সময় পাঁচ টাকা, দশ টাকা করে ওর পকেটে গুঁজে দেন। টিফিন বক্স ভরা খাবার তো থাকেই। ওই টাকা দিয়ে বিল্টু যা খুশি কেনে। ওর মতো পকেট থেকে টাকা বের করে নিজে হাতে দোকান থেকে জিনিস কেনার জন্য আমারও মনটা ছটফট করতে থাকে।

'একদিন ছোটপিসির কাছে চেয়েই বসি, 'আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?'

''টাকা? ওমা, টাকা দিয়ে তুই কী করবি?' সে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

''জিনিস কিনব।'

''কী জিনিস, শুনি। কোন জিনিসটার অভাব আছে তোমার?'

''ঘুড়ি-লাটাই, রাবারের বল, এই সব।'

'ঠিক ওসবই কিনে দেওয়া যাবেখন। এখন পালাও।' টাকা তো দিনই না উল্টে পাঁচকথা শুনিয়ে দিল।

তারপর?'

'দুদিন পর। রোববারের দুপুর। ছোটপিসির ঘরে ঢুকে দেখি, সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। টেবিলের কাছে গিয়ে এটা সেটা নাড়াচাড়া করতে পরতে সামনের তাকের দিকে নজর পড়ে গেল। মাঝের তাকে পিসির লক্ষ্মীর ঘটটা আমার দিকে চেয়ে যেন মুচকি হাসছে।

'নেড়ে চেড়ে দেখি, ঘটটা বেশ ভারী। সেটাকে যথাস্থানে রেখে খিড়কির দরজা দিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। তাকের পাশের জানালাটা হাট করে খোলা, আগেই দেখেছি, পরদাটা অবশ্য ফেলাই ছিল।

'পরদার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে ঘটের গায়ে আলতো একটা ঠেলা দিতেই, সেটা ঠকাস করে মেঝেতে পরে ভেঙে একেবারে দশ টুকরো।

'হুড়মুড় করে উঠে বসল ছোটপিসি। বিছানা থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে ঘটের টুকরো ওপর পা পড়ে গেল। 'উঃ' করে এক পা তুলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে জানালার কাছে গিয়ে পরদা ফাঁক করেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হতচ্ছাড়া বেড়াল। দাড়াঁ মজা দেখাচ্ছি। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।'

'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পাশের বাড়ির পাঁচিলের ওপর পুষিটা চুপ করে বসে আছে। মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার খিড়কির দরজা দিয়ে ছোটপিসির ঘরে ঢুকে পড়লাম। সময় মতো জানলার কাছ থেকে সরে পড়েছিলাম বলেই পিসি আমায় দেখতে পায়নি।'

'ইস কী কান্ড, অমন সুন্দর ঘটটা কেমন করে ভাঙলো গো পিসি? কে ভাঙলো?' বলতে বলতে উবু হয়ে বসে হাঁতড়ে হাঁতড়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকা সিকি, আধুলি, এক টাকার কয়েন যা পেলাম, কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে ফেললাম।

'একমুঠো খুচরো পয়সা আর তিনটে একটাকার কয়েন এর মধ্যে পকেটে পুরে ফেলেছি। টুকাইর মতো আমিও যেন নিজের অজান্তে একটা ঘরের মধ্যেই কাজটা করে ফেললাম।

'তার পরদিন। গুণে দেখি সবশুদ্ধু বারো টাকা। কিন্তু এ টাকা দিয়ে আমি কী করব ভেবেই পেলাম না। ওগুলো হাতে নিলেই আমার গা-টা কেমন শিরশির করতে থাকে।

'কী আর বলব? জানো এখনও সেগুলো আমি খরচ করতে পারিনি। মাস ছয়েক হয়ে গেল। আমার পেনসিল বক্সের কাগজের তলায় রেখে দিয়েছি। এই ঘটনার পর থেকে পকেট থেকে টাকা বের করে নিজে হাতে জিনিস কেনার ইচ্ছেটাই আমার চলে গেছে।

'আচ্ছা বুদ্ধুমামা, কয়েনশুদ্ধু ওই খুচরো পয়সাগুলো তো কুড়িয়েই পাওয়া। এটাকে কি তুমি চুরি বলবে?' ছলছল চোখে বুদ্ধুমামার দিকে তাকায় তোতন।

'ঠিক আছে। পয়সা কুড়িয়ে পাওয়ার জন্য ইচ্ছে করে ঘট ভেঙে ফেলাকে তুই যদি চুরি বলতে না চাস না বললি। কিন্তু আসল কথা, কাজটা ভালো নয়। আর এটা তুই বুঝতে পেরেছিস বলেই একটুও শান্তি পাচ্ছিস না। দিনরাত ঘটনাটা মনের মধ্যে ঘচঘচ করে বিঁধছে। আর, কখনও এমন কাজ পারবি না।'

'কক্ষনও না। কিন্তু এবার পয়সাগুলো নিয়ে আমি কী করি, বলো তো? ছোটপিসিকে ব্যপারটা বলে ফেরৎ দিতে গেলে তো খেপিয়ে মারবে।'

'না। না। তোর ছোড়দিকে বলা যাবে না। সে তো চলমান গেজেট। ঘরে বাইরে কারও আর জানতে বাকি থাকবে না। টাকাটা তুই ওকে ফেরৎ দিতে চাস তো। ভেরি গুড। তবে একটা কাজ কর। সুযোগ বুঝে একদিন ওগুলো ছোটপিসির ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে দে। স্কুলের দিদিমণি তো। মাস গেলে বেশ মোটা টাকাই পায়। বারোটা টাকা ব্যাগে এল কি গেল খেয়ালই করবে না।'

তোতনের চোখ খুশিতে ঝলঝল করে ওঠে। বুদ্ধুমামার বুদ্ধির কোনও তুলনা হয় না। ছোটদের মনের কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে বলে তাদের সমস্যার সমাধানও কত সহজে করে ফ্যালে।

এবার মামাই।

'আমি বাবা কোনোদিন চুরি-টুরি করিনি।' ভারিক্কি চালে বলে মামাই।

'তবে তুমি বিদেয় হও। আমি গল্প শুরু করি।' বুদ্ধমামার গলাটাও বেশ গম্ভীর।

'চটছ কেন? শোনেই না। চুরি নয়, তবে চুরির মতোই একটা কাজ করে ফেলেছিলাম। শুনে মাথায় গাঁট্টা মারবে না তো?'

'ওদের মেরেছি?'

'তবে শোনো। তোমরা সবাই জানো, পুতুল খেলতে আমি কত ভালবাসি।' শুরু করে মামাই, 'বম্বে থেকে সেবার মেজোমাসি আমায় একটা মেমপুতুল এনে দিয়েছিল। সোনালী চুমকি বসানো নীল রঙের গাউন পরা। খেলতে খেলতে একদিন দেখি, গাউনটা ছেঁড়া। ওই বাবলির কান্ড।

'গাউন আর কী করে বানাই। ভাবলাম এবার থেকে ওকে শাড়িই পরাবো। মা, কাকিমা, ছোটপিসি, বড়মাসি মক্কলের

কাছে সুন্দর দেখে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় চাইলাম।

'এমন সব কিপটের দল, রঙজ্বলা ব্লাউজ, ঘরমোছা ন্যাতার মতো পুরনো পচা শাড়ির টুকরো নিয়ে বলে, যে পুতুলের কাপড় বানা।

'আচ্ছা তোমরাই বলো, আমার অমন রাজকন্যার মতো পুতুলকে কি ওসব মানায়?'

'ঠিকই তো।' বুদ্ধুমামা সায় দেয়।

তার কয়েকদিন পর। দুখানা জর্জেট আর একখানা পিওরসিল্ক ভেল্টুমামার হাতে দিয়ে মোড়ের দোকানে ফলস লাগাতে দিয়ে আসতে বলল ফুলমাসি।

শাড়িগুলো খাটের ওপর রেখে গগলস আনতে ভেল্টুমামা সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে গেল।

ব্যাস সুযোগ এসে গেল। সুবর্ণ সুযোগ, ড্রয়ার থেকে ছোট কাঁচিটা বের করে, নীল মর্জেটের কোমরের দিক থেকে সরু একফালি কাপড় কুচকুচ করে কেটে নিলাম। ঠিক পুতুলের কাপড়ের মাপে। এক ইঞ্চিও বেশী নিইনি।

গগলস চোখে নেমে এসে ভেল্টুমামা সোজা মোড়ের দোকানে।

রঙ মিলিয়ে ফলস বাছতে গিয়ে দোকানদার একেবারে থ।

'এ কি? একটা শাড়ি দেখছি কাটা।'

দেখে শুনে ভেল্টুমামারও চক্ষুস্থির। বলল, 'দিন ওটা ফেরৎ নিয়ে যাই। ছোটদিকে বলব শাড়িটা অচল হয়ে গেল।'

'না, না। অচল হবে কেন? আপনার ছোড়দিকে বলুন এই রঙের কোয়ার্টার মিটার কাপড় কিনে আনতে, এমন নিখুঁত জোড়া লাগিয়ে দেব, কেউ বুঝতেই পারবে না। কোল আঁচল তো। মজুরীটা অবশ্য একটু বেশিই পড়বে।'

কাপড় নিয়ে চলে এল ভেল্টুমামা, এসব কথা যখন ফুলমাসিকে বলছে, আমি তখন সামনে দাঁড়িয়ে।

শাড়ির অবস্থা দেখে ফুলমাসি তো কেঁদেই ফেলল। দোকানে নিয়ে শাড়িটা কে ফেরৎ দেবে, তারও তো উপায় নেই। গত পুজোয় মেজমাসি ওটা তাকে প্রেজেন্ট করেছে। বম্বে থেকে কেনা। তখন যত রাগ গিয়ে পড়ল মেজমাসির ওপর।

'জানি, মেজবৌদির নজরটা চিরদিনই ছোট। যত রাজ্যের ছেঁড়া ফাটা সেলের জিনিস ছাড়া যেন কিনতেই পারে না। কাউকে দিতে হলে হাতটা আরও গুটিয়ে ফ্যালে।'

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওই সুন্দর পুতুলটা মেজমাসিই তো আমায় দিয়েছে। আর আজ আমার জন্যই কি না তাকে কত নিন্দেমন্দ শুনতে হচ্ছে।

নিজের ওপর খুব রাগ হয়ে গেল। কপালে যা থাকে হোক, মেজমাসিকে মিথ্যে বদনামের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে।

দুপুরবেলা। একা একা শুয়ে একটা বই পড়ছিল ফুলমাসি। চুপি চুপি গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। 'ফুলমাসি, একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?'

'তোমার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি? তুমি যে আমার মাম্মিসোনা। বলো, কী বলতে চাও।'

'মেজমাসির কোনও দোষ নেই। তোমাকে আস্ত কাপড়েই দিয়েছে। আমিই একটা টুকরো কেটে নিয়েছি।'

'কেটে নিয়েছিস? কেন কেটে দিয়েছিল?' চট করে উঠে বসল ফুলমাসি। চোখ দুটো লাল, নাকটা ফোলা, ভুরু কোঁচকানো দাঁতগুলোও যেন বড় বড় হয়ে গেছে। ফুলমাসির এমন চেহারা আমি আগে কখনও দেখিনি।

'পুতুলের শাড়ি বানাবো বলে।' বলতে বলতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম।

হতভম্বের মতো একটু চেয়ে থেকে ফুলমাসি হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে হো হো করে হাসতে হাসতে সে কী আদর।

'দুর বোকা। জানিস না, দোকানদার কাপড়ের টুকরো জুড়ে শাড়িটা নতুন করে দেবে। কালই পাঠিয়ে দেব। তারপর ওই দরজির দোকান থেকে তোকে একঝুড়ি পুতুলের কাপড় এনে দেব।'

'এবার তোমার গল্প বলো।' বুদ্ধুমামাকে তাড়া দেয় মামাই।

'নাঃ আজ থাক।' মাথা নাড়ে বুদ্ধুমামা। 'তোদের তিনজনের কাছ থেকে মেন চমৎকার তিনটে চোরের গপ্পো শোনার পর আজ আর ইচ্ছেই করছে না।'

'আমাদের স্বীকারোক্তিকে তুমি চোরের গপ্পো বলছ? আমরা চোর?' মামাইর চোখভরা জল।

'তাই তো, বিরাট অন্যায় হয়ে কাছে। এগুলো চোরের গপ্পো হবে কেন? তারা কি এমন সাহস করে নিজেদের কীর্ত্তির কথা কাউকে বলতে পারে?'

'তবে গপ্পো বলছ না কেন?'

'সত্যি বলছি। আজ একটা কাজ আছে। এক্ষুনি যেতে হবে। রাগ করিস না। নিজে বলার বদলে তোদের কেমন গপ্পো বলা শিখিয়ে দিলাম।'

'এগুলো কি গপ্পো, সবই তো সত্যি ঘটনা।' তোতন বলে।

'সুন্দর করে সাজিয়ে বললে সত্যি ঘটনাগুলোই তো গপ্পো হয়ে যায় রে।' উঠে দাঁড়ায় বুদ্ধুমামা।

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রকৃতির ভারসাম্য

প্রদীপকুমার রায়

প্রাচীনকালে বারাণসীর
রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত।
তাঁর আমলে বৃক্ষদেবতা
হয়ে জন্মান বোধিসত্ত্ব।
বোধিসত্ত্ব বনের মধ্যে
বাস করতেন বিশাল বৃক্ষে
আর এক মূর্খ বৃক্ষদেবতা
মেজাজটা তাঁর খুবই তিরিক্ষে।

সে জঙ্গলে হিংস্র দু'টো
সিংহ ও বাঘ বিরাজ করত
পথচলতি মানুষরা সব
পেন্নাম ঠুকে ভেগে পড়ত।
সিংহ বাঘ শিকার ধরত,
আর খেত সেই পশুর মাংস।
পেটে ধরবে কতটুকু আর
পড়েই থাকত অধিকাংশ।
বনের ভেতর পচত সে লাশ
দিবা-রাত্রি সকাল-সন্ধে
মানুষ জনের কথাই তো নেই,
ভূত পালাত বদ-গন্ধে।

সেই যে মূর্খ বৃক্ষ দেবতা
তিনি বললেন, বোধিসত্ত্বে
বিকট পচা মাংসের গন্ধ
আর পারি না সহ্য করতে।
গাছের ফলই খাচ্ছি আমরা,
আমিষ নয় আমাদের ভোজ্য,
ওদের এমন বেয়াদপী
আর কতকাল করব সহ্য?
এসো তাড়াই ভয় দেখিয়ে
ওই দুটো বেয়াড়া জন্তু
ওদের সাথে পালিয়ে যাবে
আর পশুরাও অধিকন্তু।
বনটা তখন বাগান হবে,
করবে 'ম ম' ফুলের গন্ধে,
আমার দু'জন দেবতা তখন
দিন কাটাব মহানন্দে।

বোধিসত্ত্ব রুক্ষ গলায়
বললেন তাকে, ওরে মূর্খ!
কি সর্বনাশ আনছিস ডেকে
বুঝছিস নে তুই, এটাই দুঃখ!
সিংহ, বাঘকে ভয় করে তাই,
কেউ ঢোকে না এই অরণ্যে
বিশাল বনের ক্ষতি হয় না,
সে তো কেবল ওদের জন্যে!
ওরা পালিয়ে গেলেই দেখিস,
এ বন হবে বৃক্ষশূন্য;
তখন থাকবি কোথায় শুনি?
নিজের স্বার্থ করবি ক্ষুন্ন।

যে ডালে তুই বসে আছিস,
সেই ডালটা তুই চাস যে কাটতে।
বজ্জাত মানুষগুলোর সঙ্গে
বুদ্ধিতে কি পারবি আঁটতে?
তাঁর ধমকে মূর্খ দেবতা
এ সব কথায় দিলেন ক্ষান্তি।
হায় রে! পরে বোঝাই গেল
কাটেনি তাঁর মনের ভ্রান্তি।
এই ঘটনার পরে বোধ হয়
সাতটা দিনও হয়নি পূর্তি
হঠাৎ মূর্খ বৃক্ষ দেবতা
ধরলেন রাতে রুদ্রমূর্তি
মূর্তি দেখেই ছাড়ল খাঁচা
সিংহ এবং বাঘের আত্মা,
পালিয়ে গেল অন্য বনে
আর কে পাবে তাদের পাত্তা?

সকাল হতেই বোকা দেবতা
বুক বাজিয়ে করেন উক্তি,
বাপরে! বেঁটকা গন্ধ থেকে
এবার আমরা পেলেম মুক্তি।
বোধিসত্ত্ব শুনে বললেন,
এটা কি তুই করলি বুদ্ধু?
কুড়ুলের ঘায় এবার যে বন
লোপাট হবে আমরা শুদ্ধু।

বলব কি ভাই ঘটনাটা
ঘটল যা তার পরবর্তী
আশেপাশের গ্রামেগঞ্জে
রটল খবর সত্যি সত্যি,
সিংহ বাঘ কি হিংস্র জন্তু
কেউ নেই আর ওই অরণ্যে
কুড়ুল কাঁধে গাছ কাটতে
ছুটল লোকে সবাই হন্যে।
কয়টা মাসও কাটল না আর
আসতে আসতে পরের বর্ষা,
কাঠুরেরা কুড়ুল মেরে
বনের দফা করল ফর্সা।
তখন মূর্খ বৃক্ষ দেবতা
বুঝতে পারেন নিজের ভ্রান্তি

নিজের ধ্বংস এগিয়ে এল
খুঁজতে গিয়ে মনের শান্তি।
বোধিসত্ত্বের সাবধান বাক্য
বুঝতে হ'ল খুব বিলম্ব,
ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে
থামল এবার লম্ফঝম্প।

মূর্খ দেবতা সিংহ বাঘকে
বোধিসত্ত্বের পরামর্শে
বলতে গেলেন, ভাই রে, এস
সবাই মিলেই থাকব হর্ষে
শুনে সিংহ-ব্যাঘ্র বলল,
তোমার একটু নেই কি লজ্জা?
ভয় দেখাতে দাঁত খিঁচোলে,
ভূতের মতন করলে সজ্জা!
আজকের এই সু-বুদ্ধিটা
সেদিন কোথায় ছিল উহ্য?
ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে
এখন কেমন ঠেলা বুঝছ?
গাল বাড়িয়ে চড় খেয়ে সেই
দেবতা ফিরলেন মনঃক্ষুন্ন।

বছর ঘুরে আসতে আসতে
বনটা হ'ল বৃক্ষশূন্য।

দেবতা দু'জন হরিয়ে আবাস
সারা জীবন পেলেন কষ্ট
একের ভুলে দুইয়ের হ'ল
একুল ওকুল দু'কুল নষ্ট।

গাছ কেটে যে নষ্ট করি
প্রকৃতির ভারসাম্য,
আমরা নিজেই নিজের অরি
এটা কি ভাই কাম্য?
পণ্ডিতেরা বুঝেছিলেন
তা বহুযুগ পূর্বে—
ভাঙলে মানুষ ঘরের খিলেন
নিজের কবর খুঁড়বে।
জীবের আয়ু হবে যে শেষ,
পার পাবে না অল্পে,

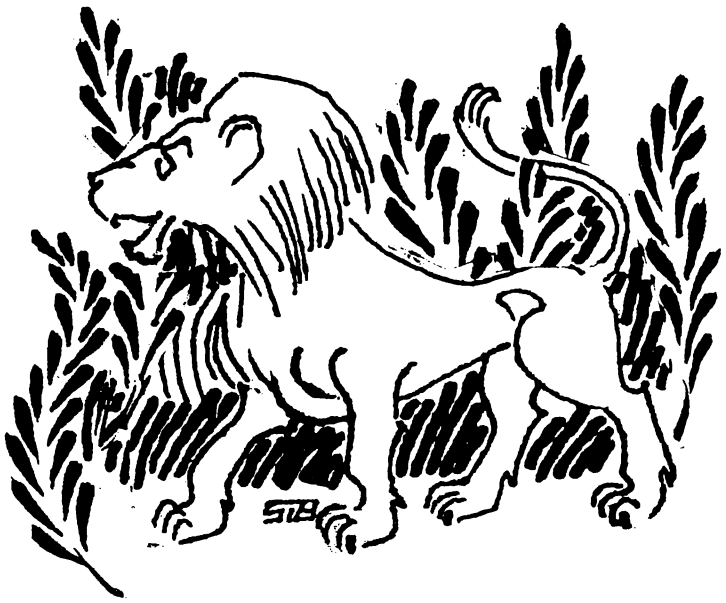

বুদ্ধদেবের এই উপদেশ
'ব্যাঘ্র-জাতক' গল্পে।

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সন্দেশ সংক্রান্ত বিবরণ

প্রকাশের স্থান	: কলিকাতা
প্রকাশের পর্যাবৃত্তি	: মাসিক পত্রিকা
প্রকাশক	: শ্রী অমিতানন্দ দাশ; ভারতীয়, ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯
সম্পাদক	: শ্রীমতী লীলা মজুমদার; ভারতীয়, ১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা ৭০০ ০২৯
স্বত্বাধিকারী	: সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড, ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯
মুদ্রক :	কালি প্রিন্টার্স অ্যান্ড বাইন্ডার্স, ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞানমতে যথার্থ সত্য।

অমিতানন্দ দাশ, এপ্রিল-২০০২

সেজদাদার উদ্ভিদপালা

দীপঙ্কর বিশ্বাস

'হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠলেন প্রফেসর বাজনদার। আমাদের দিকে তাকিয়ে। 'দিশি আমগাছে ল্যাংড়া আম ফলানোটা কোনও ব্যাপারের ভেতর পড়ে না। ওটা যে কোনও প্যাংলামার্কা বৈজ্ঞানিক, যে গাছের ওপর শব্দের প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই অনায়াসে করতে পারবে। শক্ত হল আমড়া গাছে ল্যাংড়া আম, কাঁঠাল গাছে বরবটি এই সব ফলানো।'

আমরা প্রফেসর বাজনদারের কথা তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে প্রবেশ করলাম ওঁর ল্যাবরেটরিতে। ল্যাবরেটরিটা বিশাল বড়ো। একটা বাড়ির চার তলায় যে অত গাছ থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলার সব ফ্ল্যাটগুলো ছাড়াও আরও অনেকগুলো ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছেন প্রফেসর বাজনদার। পছন্দ মতন সাজিয়ে তুলেছেন নিজের ল্যাবরেটরি।

প্রফেসর বাজনদার বলে চললেন, 'ল্যাবরেটরির পুরো ছাতটাই পার্ট বাই পার্ট পুরো গুটিয়ে নেওয়া যায়। রোলিং শাটারের মতন। রোদ্দুর হল গাছের প্রাণ। গাছেরা ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে জল খায় তা....র পর রোদ্দুর। ঝাড়া পাঁ....চ ঘণ্টা। তারপর অন্য কাজ।'

'গাছেরা কী ঘুমোয় নাকি?'

'সেটাও জানো না!! গাছেরা শুধু ঘুমোয় না রীতিমত নাক ডাকায়। যারা গাছের নাকডাকা চেনে না তারা ভাবে ওটা গাছের ফাঁক দিয়ে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সুরেলা শব্দ। আহাম্মকগুলো একটা কথা ভেবে দেখে না, ওই আওয়াজগুলো দিনের বেলা শোনা যায় না কেন? রাত দশটার পর যে কোনও গাছকে ঠেলা দিয়ে দেখবে ওদের নড়াতে অনেক বেশি জোর লাগে। ওরা ঘুমের ঘোরে সিঁটিয়ে থাকে। নড়তে চায় না ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে। তারপর আরো জোরে ঠেলা দিলে ওরা উপায়ান্তর না দেখে নড়ে চড়ে ওঠে।

'প....প....পা....'

'হ্যাঁ পায়ের কথাও মনে হয় এক্ষুনি প্রফেসর বলে উঠবে। গাছের পাও থাকে।'

'আঃ। সেজদা বলছে এ আমরা কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম।'

ল্যাবরেটরির সঙ্গে আমরা কলকাতার মিউজিয়ামের কেমন যেন মিল পাচ্ছিলাম। একসার টেবিলের ওপর ওপর ছোট ছোট কাঁচের বয়মে ছোট ছোট গাছ। একটা একঘেঁয়ে বাজনা একটানা বেজে চলেছে। ঘুমপাড়ানি গানের মতন। বয়মের গাছগুলো আমাদের চেনা চেনা

লাগলেও বড়ো অচেনা। অন্য দিকটায় একটা লেখালিখি করার ছোট ড্রয়ার লাগানো টেবিল। তার ওপর কটা বুককেস।

আমাদের মুখের ভাব দেখে প্রফেসর বললেন 'ঠিক। চেনা কিন্তু অচেনা—। হাঃ হাঃ। এগুলো সব বনসাই তাই চিনতে অসুবিধে হচ্ছে। বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, মেহগিনি, বিরাট বিরাট সব গাছের এরা বনসাই মানে বামন সংস্করণ। চলতি পদ্ধতিতে একটা বনসাই বানাতে কতো খাটতে হয়। আমার স্রেফ বাজনা। এই বাজনাটা একটানা বাজলে গাছের মেটাবলিজম্ মানে খাবার পরিপাক করার ক্ষমতা হাজার গুণ কমে যায়। গাছ হয়ে ওঠে বনসাই।'

ব্যাপারটা একটু গোড়ার থেকে বলতেই হচ্ছে। আমরা, মানে মেজদা, সেজদা, ঢাকনাদা, গনেশ, ছকু আর আমি শিয়ালদা থেকে ট্রেনে চেপে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে চলেছি পিকনিক্ করতে। ছকু মেজদাদার সাইকেল কাণ্ডর পরে ছিঁচকে চুরি ছেড়ে দিয়ে আমাদেরই একজন হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে হাঁড়ি, কুড়ি, স্টোভ টোভ যা যা থাকার সব আছে। বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে মেজদা আর ঢাকনাদাদের জনাদশেক বন্ধু আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।গাড়িতে বেশ ভিড়, কেউই প্রায় বসতে পাইনি। আমি আর গণেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি বিরিয়ানি সাঁতলাতে হয় কিনা তাই নিয়ে গভীর আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ ভিড়ের ভেতর কোত্থেকে একটা হাত এসে আমার ডান কনুইটা চুলকে দিল। আমি প্রথমে ভাবছিলাম হাতটা পকেটমারেরই হবে কারণ আমার পাঞ্জাবীটা ছোট, পকেটটা কনুইয়ের খুব কাছে তার ওপর ওতে তিন চারটে টাকাও আছে। গল্প থামিয়ে আমি আড় চোখে নজর রাখলাম পকেটের দিকে। অচেনা হাতটা আবার এগিয়ে এসে আমার কনুই চুলকে দিল। এবার বুঝলাম হাত আমার পাশের লোকটার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় বড় বড় উস্কোখুস্কো চুল। নিজের ভেবে, আমার কনুই চুলকে আরামে আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছে। প্রথমে আমার মনে হল লোকটা পাগল তারপরে মনে হল ভবঘুরে বা করি। কিন্তু 'এটা কী হচ্ছেটা কী!' বলতেই লোকটা 'কে কে কে কে কি কি কি কি Kohrabi Ku Klux Klan' বলে চমকে উঠে এমন বিষম খেল যে আমি আর গণেশ বুঝতে বাধ্য হলাম যে এ বৈজ্ঞানিক না হয়ে যায় না। অন্যমনস্ক হয়ে ফরমূলা, টরমূলা ভাবছে।

আমার কনুই চুলকে ফেলার জন্য তিনটে Sorry আর পাঁচটা Excuse me বলে এক গাল হেসে লোকটা ডান কনুইটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। 'রিভেঞ্জ নেবার বাসনা থাকলে চুলকে নিতে পারো।'

আমি গম্ভীরভাবে একটু তাচ্ছিল্যের টোন-এ বললাম,—'থাক্ ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কী বৈজ্ঞানিক?'

'ঠিক ধরেছ কিন্তু বুঝলে কী করে?'

মেজদা যে ভিড়ের ভেতর এতক্ষণ সব কথা শুনছিল সেটা বোঝা গেল, 'আমি তো ওই একটা কথা থেকেই বুঝলাম আপনি বোটানিস্ট। কারণ Kohlrabi মানে ওলকপি বলে লাফিয়ে ওঠা একজন বৈজ্ঞানিককেই মানায়। বাকিটা বাদই দিলাম।'

গণেশও ছাড়ার পাত্তর না। শার্লক হোমস-এর মতন মুখ করে গণেশ বলল, 'আমি কিন্তু আরো খবর জানি। আপনার নাম বিজন ধর। এম. এস. সির পর অ্যামেরিকায় পি. এইচ. ডি করেছেন।'

এতো বড়ো হাঁ হল লোকটার 'এতো কথা তুমি—'

'It is elementary মিস্টার ধর। আপনার ভিজিটিং কার্ডটা উঁচু হয়ে উঁকি মারছে আপনার বুক পকেট থেকে।'

জানা গেল প্রফেসর ধর সত্যিই বোটানিতে গভীর রিসার্চ করেন। যাবতীয় গাছ-গাছালি, উদ্ভিদ টুদ্ভিদের ওপর শব্দের প্রভাব নিয়ে। অ্যামেরিকায় হারভার্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। নামটা বিজন ধর থেকে অ্যামেরিকান কায়দায় প্রথমে হয়েছে বিজন দার তারপর বাজনার ব্যবহারের জন্য হয়েছে বাজনদার। দেশে ফিরে, কলকাতায় বেহালা চৌরাস্তার কাছে নিজের পছন্দ মতন ল্যাবরেটরি করেছেন প্রফেসর বাজনদার। সেখানে উদ্ভিদের ওপর বাজনার আশ্চর্য সব নতুন প্রভাবের বিষয় গবেষণা চালিয়ে চলেছেন তিনি। 'এই acousto-botany মানে শব্দ প্রভাবিত উদ্ভিদবিদ্যা সাবজেক্টটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত ভাবে হঠাৎই introduced হয়েছে। শুনলে তাক্ লেগে যাবে। অবশ্য—হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালার গল্প আগেই ছিল। আমি আকজাল ওটাকে আর নিছক গল্প মনে করি না। আমার মনে হয় ওটাই acousto-biology-র প্রথম নিদর্শন।

বছর পনের আগে জার্মানিতে একটা গার্ডেন পার্টিতে ডন ব্রেয়ার নামের এক বিখ্যাত ভায়োলিনিস্ট একটা নতুন কম্পোজিসন বাজাচ্ছিলেন। দু লাইন বাজাতেই মাথার ওপর একটা মেপ্‌ল্‌ গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে একটা আইসক্রীম খেয়ে ব্রেয়ার আবার বাজালেন। আধ মিনিটের ভেতর একটা আরো মোটা ডাল ভেঙে পড়ল মাথায়। ভায়োলিন বাজিয়েরা খু....ব জেদী হয়। একবার শুরু করলে কিছুতেই থামতে চায় না। একেবারে শেষ করে তবে ছাড়ে। ব্রেয়ার মাথায় পট্টি বেঁধে দুটো মটন চপ খেয়ে কম্পোজিসন শেষ করতে লাগলেন। এক মিনিটও কাটল না। গাছ থেকে একটা ইয়া মোটা ডাল মড় মড় করে ভেঙে ব্রেয়ারের মাথায়। ব্রেয়ার চিরতরে চোখ বুজলেন। তাঁর আর ডিনার খাওয়া হল না। ওই পার্টিতে ছিলেন একজন, বোটানিস্ট, রিচি ওয়ার্নার। তাঁর মনেই চিন্তাটা প্রথম এল। তিনি ব্রেয়ারের কম্পোজিসনের কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তারপর এক ভায়োলিনিস্ট কে জুটিয়ে নানা রকম গাছ গাছালির ওপর পরীক্ষা করে দেখলেন গাছেরা সব, ব্রেয়ারের বাজনা শুনে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে, কাতরাতে থাকে, নুয়ে পড়ে। ব্যস। নতুন সাবজেক্টের জন্ম নিল শব্দ-উদ্ভিদবিদ্যা বা acousto-botany, আমাদের নারকেলের মালার সাইজের হাঁ দেখে বাজনদার বললেন 'বিশ্বাস না হবারই কথা। তা....আমার ল্যাব-এ একদিন তোমরা এস। দেখতে পাবে acousto-botany-র অভূতপূর্ব আশ্চর্য কৃতিত্ব।'

কথা মতন আজ আমরা প্রফেসর বাজনদারের ল্যাব দেখতে এসেছি।

প্রথম ঘরের বনসাইগুলো ভালো করে দেখে পরের ঘরে আমরা গেলাম একটা অ্যান্টিরুম দিয়ে। দুটো বড়ো ঘরের মাঝে একটা ছোট্ট ঘর। দরজায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতেই দরজা পিছলে ঢুকে গেল দেওয়ালের ভেতর। প্রফেসর আমাদের ছোট ঘরে ঢুকিয়ে এ পাশের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ওপাশের ঘরে আমরা ঢুকলাম ওপাশের দরজা খুলে। এক ঘরের বাজনা মানে শব্দ যাতে অন্য ঘরে না পৌঁছোয় তাই এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ঘরের বাজনা একদম অন্য। খাড়া গাছ থেকে লতানে গাছ তৈরি করেছেন প্রফেসর, স্রেফ বাজনা বাজিয়ে।

লতানে আমগাছ দেখে আমার হাসিই পেয়ে গেল। বড়ো বড়ো ল্যাংড়া আম লুটিয়ে আছে মাটিতে। সেই আম খাবার জন্য আমগাছ যেন কাতর অনুরোধ জানাচ্ছে। লতানে নারকোল গাছও বানিয়েছেন প্রফেসর তাঁর শব্দের যাদু দিয়ে। ঘরের ভেতর একটা মোটা থামে পাক দিয়ে সে ফিট ছয়ের উঁচুতে নারকেল ঝুলিয়ে রেখেছে। আমাদের দেখা শেষ হলে পরের দরজায় চাবি ঘোরালেন প্রফেসর বাজনদার। দরজা পিছলে দেওয়ালের ভেতর সেঁধিয়ে আমাদের ঢুকতে দিল অ্যান্টিরুমে।

পরের ঘরে ঢুকে বাজনদার বললেন 'আলিবাবার চেয়ে তোমাদের ঢের বেশি সৌভাগ্য। আলিবাবার গুহায় এতো রকমের আশ্চর্য জিনিস ছিল না। আমার এই গোপন রিসার্চের কথা জানতে পারলে যে কোনও বোটানিস্ট তার সর্বস্ব খরচ করে দেখতে আসবে।'

'এই সব আবিস্কারের কথা এই ল্যাবরেটরির বাইরে কে....উ জানে না?'

'কেউ না!' হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'কাকপক্ষীরা অবশ্য জানে। ওরা যাতায়াত করে। কিন্তু ওদের ভাষা তো মানুষ বোঝে না—'.

আমরা তন্ময় হয়ে দেখছিলাম Acousto-botany-র চমৎকার কীর্তি। এই ঘরের মিউজিক সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আগের ঘরের উল্টো। বাজনা বাজিয়ে লতানে সব গাছেদের খাড়া দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর বাজনদার। কুমড়ো, লাউ করলা গাছেরা তাদের বিনীত লতানে ভাব ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে। চার পাঁচ ইঞ্চি চওড়া গুঁড়ির অঙ্গে অঙ্গে শোভা পাচ্ছে প্রমান সাইজের লাউ, কুমড়ো, করলারা। প্রফেসর বাজনদারকে অনেক বাহবা আর অভিনন্দন জানিয়ে আমরা পৌঁছোলাম পরের ঘরে। এ ঘরটা অনেক বেশি বড়ো আর উঁচুও অনেক বেশি। ছাতটা পুরো খোলা। ছাতের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত গাছ তারা স্বাভাবিক অবস্থার দু তিন ফিট-এর বেশি উঁচু হয় না। সব্‌জীর সখ আছে মনে হল প্রফেসর বাজনদারের। পাতিলেবু, লঙ্কা, টমেটো, বেগুন গাছেরা মাশরুমদের সাথে দৈত্যের আকার ধারণ করেছে। একটা বাজনা তারস্বরে বাজছে দ্রুত লয়ে, থেকে থেকে দৈত্যাকৃতি গাছেরা দুলে উঠছে। ওপর দিকে ভালো করে তাকিয়ে আমাদের মাথা ঘরে গেল। এতো আবাক আমরা জীবনে হইনি। লঙ্কা, লেবু, বেগুন, টমেটোরা সব জালার সাইজের, দশ, বারো, চোদ্দ ফিট ওপরে ঝুলে রয়েছে। দুর্গোপূজোর নৈবেদ্য মাথার গামলার সাইজের মাশরুমেরা। চার পাঁচ ফুট উঁচুতে অল্প অল্প দুলছে।

আমাদের মুখের ভাব দেখে হাহা করে হেসে উঠলেন প্রফেসর বাজনদার। 'দেখ ভালো করে দেখ। টমেটো গাছে, বেগুন গাছে কাকের বাসা। ওদের ফলের সাইজ দেখেছ তো। একটা মাথায় পড়লে রক্ষে থাকবে না। তবে বোঁটা খুব শক্ত, হঠাৎ মাথায় পড়ার চান্স কম। এগুলো অবশ্য শুধু বাজনা বাজিয়ে হয়নি। সঙ্গে জেনেটিক মিউটেশনও করতে হয়েছে। Metabolism রেট বাড়াতে হয়েছে হাজার হাজার গুন। ওরা গোগ্রাসে গেলে, হজম করে আর বড়ো হয়। সরাসরি প্রোটিন হজম করতে পারে ওরা। প্রফেসর বাজনদার হঠাৎই বললেন 'ইস্! তোমাদের ছবি তোলা হয়নি। যারা ল্যাবরেটরি দেখতে আসে আমি তাদের ছবি তুলে রাখি।' মেজদার কপালে ভারি কোঁচ পড়ল। 'আমার কাছে দামী পোলারয়েড ক্যামেরা আছে, নিমেষে ছবি তৈরি হয়ে যায়। Hearing aid-টা লগাতে ভুলে গেছি ওটাও লাগিয়ে আসি। এতোরকম বাজনা শুনতে শুনতে আমি আধকালা হয়ে গেছি। তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে বেশ অসুবিধেই হচ্ছে। ক্যামেরাটা বোধ হয় খুঁজতে হবে—কোথায় যে রেখেছি—। একটু সময় লাগবে।' প্রফেসর অ্যান্টিরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে একটা বেশ জোরালো আতরের গন্ধ। সেজদা বলল 'ব্....বেড়ে গগন্ধ চারপাশে।'

ঢাকনাদা বলল 'হিন্দিতে যাকে বলে খুবসু—'

গণেশ শুধরে দিল, 'আঃ ঢাকনাদা ওটা খুবসু নয় খুশবু।'

'আরে শেষ করতে দিবি তো। আমি বলছিলাম খুবসুরৎ বু মানে খুশবু।' মেজদা অনেক্ষণ কোনও কথা বলেনি। কিছু ভাবছিল গভীর ভাবে। হঠাৎ বলে উঠলো 'হুঁ ঠিক। খুবসুরৎ বু মানে খুশবু কিন্তু কেন? খুশবুর তলায় একটা যেন বদবু মানে দুর্গন্ধ লুকিয়ে আছে।' আমরা মেজদার কথায় খেয়াল করলাম যে কোনও একটা বদবুকে চাপা দেবার জন্যই এই খুশবু ছড়ানো হয়েছে।'

'কিন্তু মেজদা এটা তো সারের গন্ধ। বাবাঃ। অত বড়ো বড়ো সব গাছ—তাদের নিশ্চয়ই প্রচুর খাবার লাগে। প্রচুর সার দিতে হয়।'

'গন্ধটা যেন কেমন—আমরা যে সব সারের গন্ধে অভ্যস্ত তেমন নয়।'

'সার তো কতো রকমের হয়। ফসফেট সার, গোবর খোল পচিয়ে সার, জন্তু জানোয়ারের হাড়গোড় পচিয়ে সার....'

'জোরালো ইঁদুর পচার মতন গন্ধ চাপা দিতেই আতর ছড়িয়েছে।'

মেজদা গম্ভীর চিন্তিত মুখে শুধু একটা 'হুঁ' বলল।

হঠাৎ আমার মনে হল ঘরটা দুলে উঠলো। আমার মাথা ঘুরছে। প্রফেসর বাজনদার ঘরের মিউজিকটা কখন পাল্টে দিয়েছেন আমরা খেয়াল করিনি। ঢিমে লয়ের একটা percussion প্রধান বিচিত্র বাজনা বাজছে। অদ্ভুত সুর অদ্ভুত তাল। ভীষন অদ্ভুত বাজনা। আমি কিছু বলার আগে গণেশই আমায় বলল, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা যেন জড়িয়ে আসছে।' সেজদাও দেখলাম কেমন ঝিম মেরে গেছে।

প্রফেসর বাজনদারের ফিরতে প্রায় দশ মিনিট লাগলো। হাতে ক্যামেরা কানে হিয়ারিং এড, প্রফেসর আমাদের দাঁড়াতে বললেন দৈত্যাকৃতি গাছগুলোর কাছে। পোলারয়েড ক্যামেরার একটা ছবি আমাদের হাতে দিলেন, 'কী? ভালো উঠেছে না?' ছবি তোলার পালা শেষ হল কয়েক মিনিটে। আমি বললাম 'গণেশ। এই অদ্ভুত বাজনাটার আবর্ত্তনের মুখে গাটা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠছে।'

'আমারও মনে হচ্ছে যে বাজনাটার জন্যেই আমার অত ঘুম পাচ্ছে।'

আমরা এগিয়ে গেলাম পরের ঘরটার দিকে। অ্যান্টিরুমের দরজা বন্ধ অন্য সব দরজার মতন। দরজায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালে তবে দরজা খুলবে।

পরের ঘরে আরো তাজ্জব কিছু দেখার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু প্রফেসর বাজনদার বলে উঠলেন 'ও ঘরটাই ল্যাবেরেটরির শেষ কামরা। ওখানে দরকারি কলকব্জা, সুইচ টুইচ আছে। ওটায় ঢুকতে দেরি লাগে অনেক অপেক্ষা করতে হয়। ওটা এখন থাক। এই বড়ো বড়ো গাছ গুলোই হোক আমাদের শেষ exhibit। আমরা

শেষ কামরার কলকব্জার অল্প আওয়াজ শুনতে পেলাম বাজনার ফাঁকে ফাঁকে। ঘর ঘর ঘর ঘর করে কোনও একটা যন্ত্র ঘুরেই চলেছে। তার সঙ্গে মট্ মট্ শব্দ। গ্রাইণ্ডার দিয়ে পেষাই করার শব্দের মতন।

মেজদা একটা বিরাট হাই তুলে অবাকমুখে বাজনদারকে শুধোল 'আচ্ছা-প্রফেসর-এতো বড়ো বড়ো গাছ তৈরি করতে কতো সময় লাগে? প্রফেসর বাজনদার এক কান থেকে হিয়ারিং এড্‌টা খুলে পরিষ্কার করতে করতে বললেন 'কি বললে আবার বলো তো।'

মেজদা প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল।

'আরে সেইটাই তো আসল কথা। মাত্তর তিন সপ্তাহে এতো বড়ো গাছ হয়।'

'মোটে তিন সপ্তাহে এই অল্প মাটিতে? তার মানে আপনাকে বিশেষ ধরনের সারের ব্যবস্থা করতে হয়। যার খাদ্য যোগানোর ক্ষমতা অনেক বেশী।'

'ঠিক ধরেছ, তোমার বুদ্ধি আছে।' চোখটা চক্ চক্ করে উঠলো বাজনদারের, মুখে তির্যক হাসি। 'জানতে খুব ইচ্ছে করছে? হ্যাঁ। বিশেষ সার তো দিতেই হয় যার প্রোটিন কন্টেন্ট খু....ব বেশি। বললাম না গাছগুলো সরাসরি প্রোটিন ডাইজেস্ট করতে পারে। গবগব করে খায়, হজম করে আর বাড়ে।'

সেজদা হঠাৎ টাল খেল। কোনওরকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলালো। মেজদা আর ছকু দুজনে দুটো হাই তুলল। বাজনাটা বেজে চলেছে অবিরাম। অন্য কানের হিয়ারিং এড্‌টা খুলে পরিষ্কার করছিলেন প্রফেসর বাজনদার। আমি আর গণেশ একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললাম 'প্রফেসর মিউজিকটা দয়া করে থামান আমাদের শরীর খারাপ লাগছে।' বাজনদার একটা অদ্ভুত হাসি হাসলেন। হাসিটা সহসা কোনও স্বাভাবিক মানুষের বলে মনে হল না আমাদের। 'একটু ধৈর্য ধরো—বাজনাটা তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে মিলিয়ে যাবে। একটা নতুন জগৎ খুলে যাবে তোমাদের সামনে। তোমরা ওই শেষ ঘরটায় ঢুকতে চেয়েছিলে—তখন তোমাদের নিয়ে যাবো ওই শেষ কামরায়।'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সকলেরই শরীর বেশ খারাপ লাগছে। মাথা ঘুরছে, ঘুম পাচ্ছে, গা বমি বমি করছে। ঢাকনাদা একটা ওয়াক তুলল।

'কিন্তু মেজদা প্রফেসর এই বাজনা সহ্য করছে কি করে?'

মেজদা চমকে উঠলো 'তার মানে বাজনদারের হিয়ারিং এড্ বন্ধ আছে। এগুলো আসলে earplug এর কাজ করছে। তাই ও, কথা শোনার সময় হিয়ারিং এড্ খুলে নিচ্ছে।' কথা শেষ হবার আগেই মেজদা একটা প্রকাণ্ড লাফ দিল বাজনদারের দিকে। কিন্তু বাজনদারের গায়ে জোর কম না। মেজদাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে, ছুটে গিয়ে, মুহূর্ত্তে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে বাজনদার আগের কামরায় ঢুকে পড়ল। মেজদা চেঁচিয়ে উঠলো 'সবাই কানে আঙুল দে। কিন্তু বোধ হয় দেরি হয়ে গেছে'। আমরা কানে আঙুল দিলাম কিন্তু ওঘরে গিয়ে বাজনদার বাজনার আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়েছেন চতুর্গুন। কানে আঙুল দিয়েও নিস্তার নেই। মেজটা বলল 'subsonic মানে খুব কম কম্পাঙ্কের শব্দে এমন শরীর খারাপ হয়। বন্ধ না করতে পারলে....' কথা শেষ করল না মেজদা।

আমরা পাঁচজন পুরো দস্তুর বন্দী। পায়ের নীচে মাটি মাথার ওপর বড়ো, বড়ো লঙ্কা, লেবু, টমেটো গাছ, নাকে তীব্র গন্ধ, কানে তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে অস্পষ্ট ঘর ঘর শব্দ ভেসে আসছে শেষের ঘর থেকে বাজনার ফাঁকে ফাঁকে।

'আমরা মারাই পড়ব। দেখ সেজদাকে দেখ উবু হয়ে বসে পড়েছে।'

'লাউড স্পীকার গুলো নষ্ট করে দিতে পারলে.... আমরা উদ্‌ভ্রান্তের মতন টলতে টলতে লাউড স্বীকার খুঁজে চললাম। পেলাম না।

মেজদা চিৎকার করে উঠলো 'স্পীকারগুলো কংক্রীটের দেওয়ালের ভেতর। কংক্রীটের পুরু জালির ভেতর দিয়ে শব্দ আসছে। ও আমরা পারব না।'

আমি বুঝতে পারছি আমরা জীবনের শেষ কিনারায়

দাঁড়িয়ে। আর কটা মুহূর্ত্ত। ব্যস্। আমার চোখে অন্ধকার ঘুমিয়ে আসছে। দু-দুবার দেখলাম স....ব অন্ধকার।

'কিন্তু প্রফেসরের আমাদের মেরে কি লাভ?'

'লাভ বেশ ভাল মতনই আছে। যদি বেঁচে থাকিস তো বুঝতে পারবি।' এতো অবসন্নতার ভেতরও হঠাৎই আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎ চমকালো 'মেজদা-শেষের ঘরটায় সুইচ আছে ওটা খুলতে পারলে সব অফ করে দেওয়া যাবে।'

মেজদার সঙ্গে সকলে লাফিয়ে উঠলো। শরীরে যেন নতুন বল ফিরে এল সকলের। ছকু দুমাস আগেও ছিঁচকে চোর ছিল। চুরি ছাড়লেও ছকু কোমরের মোটা চাবির গোছাটা ছাড়েনি। মেজদা এক হ্যাঁচকা টানে চাবির গোছাটা ছিনিয়ে নিয়ে পাগলের মতন শেষ ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো। ছক এক লহমা অপেক্ষা করে মেজদার কাছ থেকে চাবির গোছা টেনে নিয়ে চাবি গলালো দরজায়। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। সেজদা শুয়ে পড়েছে। ঢাকনাদা দুহাতে মুখ চেপে বসে। আচমকা দরজা খোলার আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

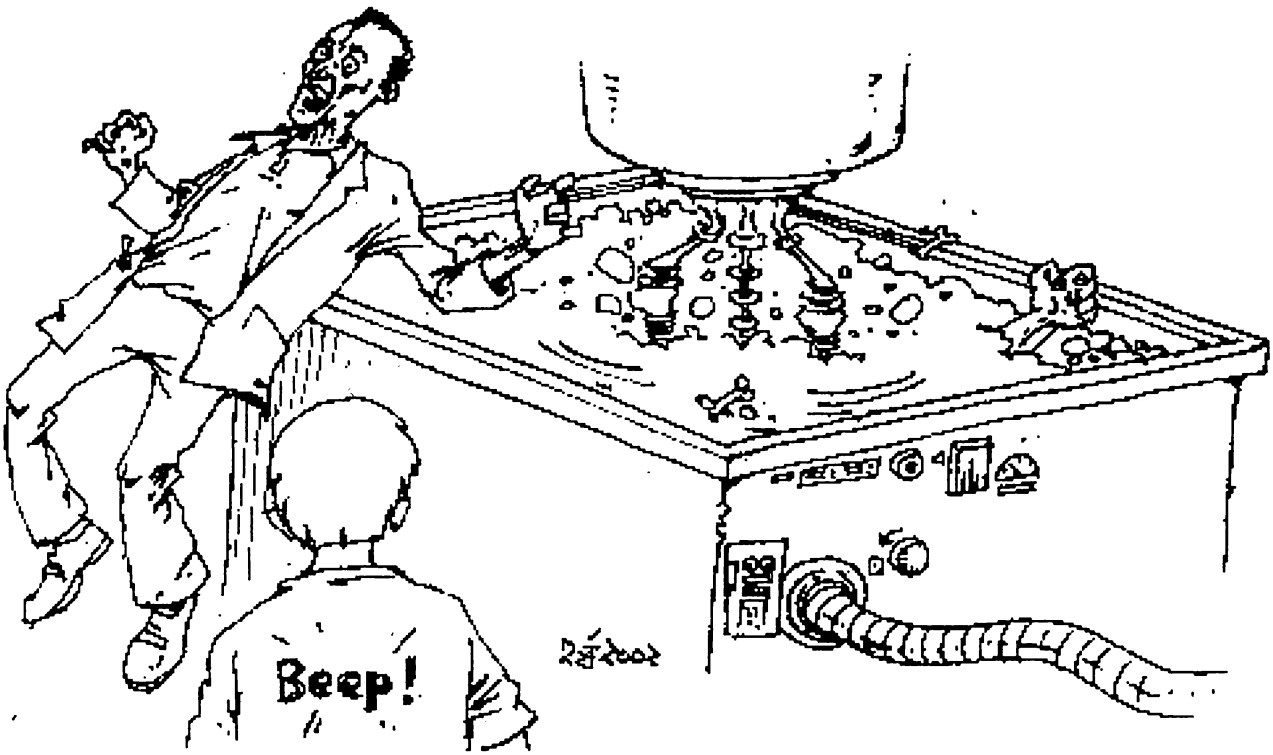

আপিসঘরের অন্য দরজা খুলছে ছকু। আমরা যেন শরীরে নতুন শক্তি পেয়েছি। আরো বাঁচবো। আমরা সকলে গিয়ে দাঁড়ালাম ছকুর চারপাশে। একটাই চাবি। একটু এদিক ওদিক করতেই দরজা পিছলে ঢুকে গেল দেওয়ালে। নিমেষে বিভীষিকা যেন চলকে উঠলো উন্মুক্ত শেষের কামরা থেকে। যে দুর্গন্ধটা আমরা আগে পাচ্ছিলাম, সেটা হাজারগুণ হয়ে আমাদের নাকে এসে বিঁধল। আমার নাড়ি সুদ্ধু গুলিয়ে উঠলো। দু দুটো 'ওয়াক' শুনলাম। একশোটা পচা লাশের গন্ধ একসঙ্গে।

আলো আঁধারিতে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম একটা বিরাট চার চৌকো লোহার চৌবাচ্চায় কিছু পেষাই হচ্ছে। তার থেকে কয়েকটা টুকরো ছিটকে উঠছে, আবার ফিরে যাচ্ছে চৌবাচ্চায়। উৎকট গন্ধ আর ঘর ঘর শব্দ আসছে ওই বিরাট প্রক্রিয়ার যন্ত্রটারই থেকে। হঠাৎ আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা ভয়ের ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। একটা রক্তাক্ত কব্জি অবধি কাটা হাত, হ্যাঁ মানুষের হাত, লাফিয়ে উঠে আবার মিলিয়ে গেল চৌবাচ্চায়। আমি আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলাম, 'উঃ মাগো' ঠিক সেই মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। আমাদেরই কেউ মেনসুইচ খুঁজে পেয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছে।

অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বুঝলাম যে রক্তাক্ত হাতটা আমি একা দেখিনি। আতঙ্কে সবার মুখ সাদা, পলক পড়ার আগেই পেছনের দরজা খুলে গেল। বাজনদার দাঁড়িয়ে, হাতে রিভলভার। রিভলভারটা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে শেষ কামরায় ঢুকে পড়লাম বাজনদার। নিমেষে চালু করল মেন সুইচ। মুহূর্তে সব চালু হয়ে গেল। আর ঠিক সেই ক্ষণে আমরা গণেশের গলা শুনলাম 'ইয়াং ফুং', গণেশের শরীরটা লাফিয়ে উঠলো কুঁকড়ে বেঁকে। তারপর স্প্রিং-এর মতন সোজা হল। কুং-ফুর একটা প্রচণ্ড লাথিতে বাজনদারের রিভলভারটা ছিটকে মিশে গেল শেষ কামরার আলো আঁধারিতে।

'তবে রে—' বলে একটা প্রচণ্ড হুংকার ছেড়ে বাজনদার বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লেন মেজকার ওপর। আমাদের দলের Co-ordination খুব ভালো। মেজকার মজবুত কুস্তি লড়া শরীর। মেজকা বেশ খানিকটা নীচু হয়ে 'ইয়া....' বলে একটা আওয়াজ করে ভীষণ

জোরে সোজা হল। মেজদার জোরালো কাঁধের ধাক্কাটা লাগল উড়ন্ত বাজনদারের জায়গা মাফিক। 'আঁ আঁ আঁ আঁ....' প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ করে বাজনদার গিয়ে পড়ল চৌবাচ্চার ভেতর। যন্ত্রের ঘর ঘর আওয়াজের ক্ষণেকের জন্য একটু পরিবর্ত্তন হল।

'আর এক মুহুর্ত্তও এখানে না।' আমরা ঘরের পড় ঘর পেরিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। আতঙ্ক আমাদের তাড়া করে চলেছে। আমরা ছুটে চলেছি ফুটপাথ ধরে। ফুটপাথের পর রাস্তা, রাস্তার পরে পার্ক। আমরা আচ্ছন্নের মতন পার্কে ঢুকে বসে পড়লাম যে যেখানে পারলাম। কারো মুখে কোন কথা নেই। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না। সকলে শারীরিক আর মানসিক অবসাদের শেষ প্রান্তে। নাকের গন্ধ আর যন্ত্রের ঘরঘর বিভৎস দৃশ্যটার সঙ্গে মনের ভেতর পাক পাচ্ছে। জানি ওরা সহজে মিলিয়ে যাবে না। অনেক সময় নেবে। মেজদা ছুটে বেরোনোর সময় বাজনদারের টেবিলের কাছে দুটো ছবি কুড়িয়ে পেয়েছিল। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সেই দিকে। কটা নিষ্পাপ মুখ। যারা বাজনদারের ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছিল আমাদের মতন। ছবিটার কপি নিশ্চয়ই বাজনদার ওদেরও দিয়েছিলেন আমাদের মতন। মিনিট পাঁচেক পরে স্তব্ধতা ভাঙলো গণেশ 'মেশিনটা কিন্তু বন্ধ করা হয়নি মেজদা।'

'আমি দেখেছি চৌবাচ্চাটার তলা থেকে মোটা পাইপের যোগ আছে গাছগুলোর মাটিতে।' একটু সময় নিল মেজদা। মাথার ওপর উন্মুক্ত নীল আকাশ। একবার তাকালো আকাশের দিকে। 'আমরা খুব জোর বেঁচে গেছি। ওই দৈত্যর মতন গাছগুলোও বাঁচুক যে কটা দিন পারে।'

ছবি : হর্ষমোহন চট্টরাজ.

চৈত্র-চিত্র

রেবন্ত গোস্বামী

শীতের বুড়ির চুলটাকে বুঝি আনল বাতাস বয়ে
সকালের রোদে ভেসে খেলে যায় ছোট্ট সুয্যি হয়ে।
সজনের গাছ একশোটা তার ঝুলন্ত লাঠি হাতে
রেশম তুলোর বলটাকে তবু পারল না আটকাতে।
শিমুল ঘেঁটুর লাল সাদা রঙ, নবীন সবুজ পাতা
বনে দিগন্তে উড়িয়ে চলেছে এ দেশের পতাকাটা।
দোল খেলা শেষে আমের শিশুরা সবুজ আবির মেখে
দোল খেলে শাখে, তারই কোন ফাঁকে কোকিল উঠেছে ডেকে।
ঘাসেরা সাজে না ভোরবেলা আর পোখরাজ মালা গেঁথে,
কুয়াশা-বিহীন সকালটা যেন একটুতে ওঠে তেতে।
বসন্ত শেষে পালটিয়ে যাবে প্রকৃতির এই খেলা;
আসবে আবার গরমের দিন, আমকাঁঠালের বেলা।

সেই লোকটা

অরুণিমা রায়চৌধুরী

লোকটাকে প্রথম দিন দেখেই মিতুর কেমন যেন ভালো লাগেনি। মিতু মা'র হাত ধরে গুট্‌গুট্ করে যাচ্ছিল। মোড়ের মাথায় জন্মদিনের কেকটা তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই ওর জন্মদিন। বিকেল হলে পাশের বাড়ির দুই বোন রুমু-ঝুমু আসবে। তারপর আসবে রিনিমাসির ছেলে টিটু আর রাঙাকাকুর ছেলে কুশল। আর তখনই তো সেই কেক কাটা হবে।

এর মধ্যেই কত মজার মজার জিনিস পেয়ে গেছে মিতু। তিনটে সুন্দর ফ্রক, তারপর দিদা দিয়েছেন কী চমৎকার একটা সোনালী চুলওলা পুতুল, একদম ওর সমান লম্বা। কুট্টিকাকু দিয়েছেন ভারী সুন্দর ছবিওলা একটা নার্সারি-রাইমসের বই। কয়েকটা রাইম ওকে পড়ে শুনিয়েওছেন। মিতু তো আর পড়তে শেখেনি এখনও। মিতুর সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে ঠাকুমার দেওয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কী বিরাট মোটা, আর কী সুন্দর ছবি বইটাতে। বড়মামু দিয়েছেন টোবু সাইকেল।

খুব খোশ-মেজাজে মা'র হাত ধরে যেতে যেতে মিতু এইসব ভাবছিল, আর ঠিক তখনই ও লোকটাকে দেখতে পেল। রোগা, লম্বা, তালপাতার সেপাইয়ের মতো। মাথায় ছোট ছোট কদমছাঁট চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভ্রূ কোঁচকানো কপাল। ফ্যাকাশে গায়ের রঙ। পরনে খাকি রঙের ময়লা একটা প্যান্ট। হাঁটুর কাছে খাবলানো। গায়ে ঢলঢলে একটা শার্ট। কাঁধের কাছে ছেঁড়া। একটাও বোতাম লাগানো নেই। রোগা, হাড়-জিরজিরে বুক। লোকটা হঠাৎ

মিতু আর মা'র সামনে পথ আটকানোর মতো দাঁড়িয়ে বলল, 'দশটা পয়সা।' মিতুর মা একটু বেঁকে ওর পাশ কাটিয়ে মিতুকে নিয়ে কেকের দোকানটায় ঢুকে নিচু গলায় বললেন, 'আঃ, জ্বালাতন।' পলিথিনের সাদা ব্যাগে কেকটা ঝুলিয়ে খুচরো ফেরৎ পয়সা ব্যাগে ঢোকাবার সময় মা দশটা পয়সা হাতে রাখলেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে মিতু দেখল লোকটা একটু দূরে এক ভদ্রলোকের সামনে হাত বাড়িয়ে বলছে, 'দশটা পয়সা।' পাশ দিয়ে যাবার সময় মা ওর হাতে দশ পয়সাটা দিয়ে দিলেন। মিতু ভয়ে ভয়ে বলল, 'মা, ও কে?'

'কে? কার কথা বলছিস?'

'ওই যে তুমি পয়সা দিলে?'

'ওঃ, ও একজন দুঃখী লোক।'

মিতু গুট্‌গুট্ করে কয়েক পা গেল। তারপর বলল, 'মা , ওই দুঃখী লোকটা না, পাজি। ও নিশ্চয় ছেলেধরা।'

'কেন? ও তোর কী করল? ছি মিতু, না জেনেশুনে কারও সম্বন্ধে এরকম খারাপ কথা বলতে হয়? আজ না তোমার জন্মদিন।'

ঠিক ঠিক। মিতু ভারী লজ্জা পেল। আজ সকালবেলাই মা বলেছেন, 'মিতু, আজ থেকে একদম দুষ্টুমি করবে না, কোনও বায়না করবে না, কাউকে কোনও পচা কথা বলবে না, কেমন?' মিতুও ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'আচ্ছা।'

তারপর কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে পরীর মতন সেজে সবাইকে প্রণাম করা, এলাচের গন্ধ আর কিসমিস দেওয়া জন্মদিনের পায়েস। আবার ওদিকে চমৎকার জন্মদিনের কেক, 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' গান, এই সবের মধ্যে মিতুর আর লোকটার কথা মনেই রইল না। এত হাসিখুশি মজার মধ্যে শুধু একবার মনটা একটু খচ্ করে উঠল, যখন কেকের ওপর তিনটে ছোট্ট মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেবার পর বাবা বললেন, 'তিন বছর হয়ে গেল, এবার তো মিতু-মার স্কুলে যেতে হবে।' অবশ্য তাই বলে সত্যি সত্যি ওর বিশ্বাসই হয়নি ও কথা। কারণ বাবাই তো সব সময় বলেন, এইটুকু বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু ক'দিন বাদে যখন সত্যি সত্যি ওকে স্কুলে পাঠাবার তোড়জোড় শুরু হল—বুকলিস্ট মিলিয়ে বই, স্কুল-ইউনিফর্ম, স্কুল-ব্যাগ, টিফিন-বক্স কেনা হ'ল, এমনকি ওর স্কুলে যাবার দিনটিও এসে গেল, মিতু তখন মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল, 'আমি কক্ষনো স্কুলে যাব না।' বাবা বললেন, 'ছি, মিতুমা, এমন করে না। স্কুলে তো সব্বাইকে যেতেই হবে। এই তো আমিও স্কুলে গিয়েছি, তোমার মাও গ্যাছেন। ওবাড়ির রুমু-ঝুমু, তোমার দাদামণি—সব্বাই স্কুলে যায়।' মিতু কেঁদে চোখ লাল করে ফেলল। সব বাজে কথা। ও যেন আর জানে না। বললেই হল, সব্বাই স্কুলে যায়। কবিদাদু স্কুলে গিয়েছেন নাকি। উনি তো স্কুলপালানো ছেলে। সেদিন হীরেনকাকু দাদামণিকে পড়াতে এসে বলছিলেন, ও যেন আর শোনেনি।

মা বললেন, 'এ কি মিতু? এত কান্নাকাটির কী আছে। স্কুলটা তো একটা মজার জায়গা। তোমার মতন কত্তো ছোটছোট ছেলেমেয়ে আসবে দেখো। ক-ত নতুন বন্ধু হবে। ওরাও তো আজ তোমার মতোই প্রথম স্কুলে আসছে।' মিতুর একটুও বিশ্বাস হ'ল না। বড়রা ভোলাবার জন্য কত কী যে বানিয়ে বলতে পারে। স্কুলটা মজার জায়গা না আরও কিছু। ওখানে তো মাস্টারমশাই বেত হাতে বসে থাকেন।

কিন্তু বড়দের সঙ্গে কি আর পারা যায়? মিতুকে শেষ পর্যন্ত মা স্নান করিয়ে, ভাত খাইয়ে, স্কুলের পোশাক পরিয়ে ছাড়লেন। তখন খেয়াল হ'ল সবার, ওয়াটার-বট্‌ল্‌ই কেনা হয়নি। মা বললেন, 'একটা জেন্টিলের বোতল পরিষ্কার করাই আছে। আজ ওতেই জল দিয়ে দিই। আজই বিকেলে নতুল ওয়াটার-বট্‌ল্ কিনে আনব।' মিতু হাত-পা ছুঁড়ে একবার শেষ চেষ্টা করল—'আমি ওই পচা জেন্টিলের বোতল নেব না।' আর দাদামণিটা কী দুষ্টু! অমনি বলে কি, 'ঠিক আছে, তুই আমারটা নিয়ে যা।' — পাছে মিতুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়!

কিরণময়ী শিশুভবনের বড় আন্টি অবশ্য বললেন, 'আজ প্রথম দিন তো, এক ঘন্টা পরেই ছুটি হয়ে যাবে। এ সপ্তাহটা এ রকমই যাবে। ওদের একটু অভ্যাস হোক! তা সেই একঘণ্টার মধ্যেই নতুন স্কুলে আসা বাচ্চাগুলোর চ্যাঁ-ভ্যাঁ কী যে কান্নাকাটি! মিতু অবশ্য বাড়িতে কান্নাকাটি করলে কী হবে, অন্য লোকদের সামনে মোটেই কাঁদে না। অনেক ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কারও সঙ্গে মোটে ভাবই হ'ল না। যা হোক, একটু পরেই ছুটি হয়ে গেল। অনেকটা রিনিমাসিদের মতো দেখতে একজন আন্টি ওদের একজন একজন করে মায়েদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বেত হাতে কোনও মাস্টারমশাই সত্যি সত্যি নেই দেখে মিতু একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। ছুটির সময় চোখে পড়ল স্কুলের গেটে সেই লোকটা মায়েদের কাছে দশ পয়সা চাইছে।

বিকেলবেলাই মা বেরোলেন মিতুকে নিয়ে ওয়াটার-বট্‌ল্ কিনতে। পপুলার ফার্মেসির সিঁড়িতে আবার সেই লোকটা। ঝল্‌ঝলে শার্টটা এখন আর পরেনি। একটা ছাই রংয়ের ছেঁড়া ছেঁড়া সোয়েটার পরেছে যদিও মোটেও শীত পড়েনি এখনও। একটা বিড়ি ধরাতে ব্যস্ত ছিল বলে লোকটা আর দশ পয়সা চাইতে পারল না।

ওয়াটার-বট্‌ল্ কেনার পর মা মন্টুদের দোকানে কী সব টুকিটাকি জিনিস কিনছিলেন। মিতু বলল, 'মা, একটা ফাইভ স্টার।'

মা বললেন, 'ছিঃ, রোজ রোজ বায়না করে না। এই তো পরশুই ফাইভ স্টার দিলাম না?'

'খুকু বুঝি ফাইভ-স্টার খুব ভালোবাস?'

মিতু মুখ তুলে দেখল কপাল-কান-ঢাকা-বড় বড় চুলওলা একটা ছেলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটার পরনে টকটকে লাল শার্ট, কোমরে একটা দারুণ চওড়া বেল্ট। অচেনা লোকেদের মিতুর দারুণ লজ্জা, তাই ও কোনও উত্তর দিল না।

'দিন না বৌদি, খুকুকে একটা ফাইভ-স্টার কিনে।'

মা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না, না, বাচ্চাদের সব আবদার অত পালা উচিত নয়।' ছেলেটার কথার উত্তর না দিলেও ওকে মিতুর একটু ভালোই লাগল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে মিতু বলল, 'ওই দাদাটাকে অনেকটা কুট্টিকাকুর মত দেখতে, না।'

'দূর, কুট্টিকাকু কি ওরকম বখাটে?'

'বখাটে কী মা?'

'আঃ মিতু, বখাটে মানে বখাটে। এখন চল্ তো।'

'দশটা পয়সা।' মিতু চমকে দেখল, সেই ভ্রূ-কোঁচকানো কপাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

মার হাতে অনেক টুকিটাকি। পয়সার ব্যাগ বোধহয় প্ল্যাস্টিকের থলেতে। তাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মাপ করো বাবা।'

বাড়ি ফিরেই খেয়াল হল মা'র, 'এই রে, টাকার ব্যাগটা কোথায়? খোঁজ খোঁজ! আবার বেরোলেন। এবার দাদামণিকে নিয়ে। সারা রাস্তা দেখতে দেখতে গেলেন — ওয়াটার বট্‌লের দোকানে, মন্টুদার দোকানে। কোথাও নেই। মা বিপন্ন গলায় বললেন, 'ওর মধ্যে যে মিতুর এসকর্ট কার্ডটা ছিল। ওটা না দেখালে তো মিতুকে ছুটির সময় ছাড়বে না।'

বাবা বললেন, 'ওরা তো আবার এখনও তোমাকে চেনেই না যে তুমি ওর মা। একটা ডুপ্লিকেট এসকর্ট কার্ডের জন্য কালই অ্যাপ্লাই করে দেব ওদের স্কুলে।'

পরদিন মিতুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে স্কুলের অফিসে গেলেন মিতুর বাবা। অফিসের চক্রবর্তীবাবু বললেন, 'সে কী মশাই। এর মধ্যে এসকর্ট কার্ড হারিয়ে ফেললেন? যাকগে, কালই ডুপ্লিকেট পেয়ে যাবেন। আজ এই স্লিপটা নিয়ে যান। ছুটির সময় এটা সঙ্গে আনবেন।'

ক্লাসে বসে সেদিন মিতুর বেশি খারাপ লাগছিল না। আন্টি একটা গল্প বললেন। বান্টি আর সৌরভের সঙ্গে ভাব হ'ল। তারপর টিফিন। আর আধঘন্টা পরেই ওদের ছুটি হয়ে যাবে। হঠাৎ ওদের স্কুলের সরলাদিদি এসে ডাকল, 'শুচিস্মিতা মুখার্জ্জি, বড় আন্টি ডাকছেন।' মিতু একটু অবাক হ'ল, ভয়ও পেল। ও তো কোনও দুষ্টুমি করেনি। ভয়ে ভয়ে বড় আন্টির ঘরে যেতেই তিনি বললেন, 'এই যে শুচিস্মিতা, তোমার মা আজ আসতে পারবেন না ছুটির সময়ে। তুমি এঁর সঙ্গে এখনই বাড়ি চলে যাও। তুমি ওঁকে চেনো তো?'

মিতু আগেই চেয়ারে বসা, লোকটিকে দেখে চিনে ফেলেছে। কালকের সেই বড়-বড় চুলওলা ছেলেটা। আজ একটা সাদা শার্ট পরেছে। মিতু ঘাড় কাৎ করে জানাল, 'হ্যাঁ।' বড় আন্টি বললেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে যান। আপনি যখন এস্‌কর্ট-কার্ড এনেছেন, তখন আমাদের আপত্তির কিছু নেই। আমরা কিন্তু ছুটি না হলে বাচ্চাদের ছাড়ি না। তবে এটা তো ইমার্জেন্সি। ওর বাবার কথা শুনে ভারী খারাপ লাগছে।'

ছেলেটা মিতুর হাত ধরে স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। মিতু একটু অবাক হয়ে বলল, 'মা আসেনি কেন?'

'তোমার বাবার যে অসুখ করেছে খুকুমণি।'

'বাবার অসুখ? বাবা তো আমাকে একটু আগেই স্কুলে দিয়ে গেল।'

'তারপর বাড়ি গিয়ে অসুখ করেছে। তাই তো তোমার মা আমাকে পাঠালেন।'

'তুমি আমাদের বাড়ি চেনো?'

'বাঃ, চিনি না? নইলে তোমার মা আমাকে পাঠালেন কী করে?'

'তোমাদের গাড়ি কখন আসে তোমাকে নিতে?'

মিতু পেছন ফিরে দ্যাখে সবুজ টি-শার্ট পরা কালো মোটা মতো আর একটা ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'গাড়ি?' মিতু অবাক হয়ে বলল, 'গাড়ি তো নেই আমাদের।'

'ধুস! এ কী পার্টি ধরেছিস রে?'

বড় চুল ছেলেটা বলল, 'আরে গাড়ি না থাকলে কী? বাড়িটা দেখে এসেছি। মালদার রে!' তারপর মিতুর দিকে ফিরে বলল, 'চলো চলো খুকুমণি, এই নাও ফাইভ স্টার। তুমি ভালোবাসো না?'

ততক্ষণে মিতুর যেন একটু ভয়-ভয় করছে। সবুজ জামাপরা ছেলেটা বলল, 'একটা ট্যাক্সি ধরি দাঁড়া, নইলে একটু পরেই মায়েরা আসতে শুরু করবে। এ পাড়ায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না।'

'আগেই ডাকিসনি কেন?'

'আরে বাচ্চা তোর কাছে ছাড়বে কিনা না জেনে আগেই কী করে ডাকব। ওই যে ট্যাক্সি। ট্যাক্সি, ট্যা-ক্‌সি!'

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল।

'উঠে পড়ো খুকু।'

মিতুর কান্না পাচ্ছিল। ও বলতে গেল, আমি যাব না কিন্তু দেখল গলা দিয়ে মোটে স্বরই বেরোচ্ছে না।

'দশটা পয়সা।' মিতু চমকে দেখল সেই লোকটা এসে হাত

বাড়িয়ে রয়েছে।

'আরে দূর পাগলা, যাঃ!'

হঠাৎ 'পাগলা' শুনেই লোকটা কেমন ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'চো-প্।' তারপর ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল বড়-চুলওলা ছেলেটার গালে। ছেলেটা দুম্ করে ট্যাক্সির দরজার ওপর গিয়ে পড়ল। ততক্ষণে মিতুর সাহস হয়েছে একটু। ও সেই রাগী রাগী লোকটার নোংরা ফ্যাকাসে হাত জড়িয়ে ধরে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। ট্যাক্সির শিখ ড্রাইভারও গোলমাল বুঝে, 'নেই যায়গা।' বলেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। ততক্ষণে কিরণময়ী শিশুভবনের দারোয়ান, অফিসের চক্রবর্তীবাবু, সৌরভের জেঠু, বান্টির মা — সবাই এসে পড়েছে, বড়চুল আর সবুজ-জামাপরা ছেলে দুটো তখন ছুটে পালাতে গিয়ে উল্টোদিকের ঘোষ ইলেক্ট্রিক্যাল্সের লোকদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।

বড়-আন্টি ছুটে এসে মিতুকে কোলে করে চক্রবর্তীবাবুকে বকতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য, ওর এসকর্ট কার্ড হারিয়ে গেছে সে কথা আপনি দারোয়ানকে বলে রাখবেন তো!' মিতু চেয়ে দেখল দশ-পয়সা-চাওয়া লোকটার চোখ দুটো যেন আর অত রাগী-রাগী মনে হচ্ছে না, এদিকে তখন মা এসে গিয়েছেন। সব কিছু শুনে মা লোকটার দিকে একটা দশটাকার নোট বাড়িয়ে বললেন, 'এর বেশি তো আমার ব্যাগে নেই। তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি চলো বাবা।' লোকটা শুধু বলল, 'দশ পয়সা।' মিতুকে নিয়ে তখন হইহই পড়ে গেছে। ওকে ঘিরে ধরে সব্বাই কত কী যে জিজ্ঞেস করছে। মিতুর মা ব্যাগ হাতড়ে একটা দশ পয়সাও বার করলেন, কিন্তু তারপর লোকটাকে আর দেখতে পেলেন না।

উঃ, তারপর বাড়ি ফিরে সে কী কাণ্ড! বাবা টেলিফোনে সব শুনে অফিস থেকে বাড়ি চলে এসেছেন। দাদু, কুট্টিকাকু, রাঙাকাকু —সব্বাই মিতুকে ঘিরে বসে আছেন। দাদামণির কী হিংসে! বলে কিনা, 'এ্যাদ্দিন ধরে আমি স্কুলে যাচ্ছি, আমাকে একদিনও একটা ছেলেধরা ধরতে এল না। আর মিতু মোটে দু'দিন স্কুলে গেছে, এর মধ্যেই ওকে ছেলেধরা ধরতে এল।' মিতু ভাবল, ভাগ্যিস স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তাই তো একদম গল্পের মতো এমন সব ব্যাপার হল! শুধু সেই লোকটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল!

পরদিন স্কুলেও আন্টিরা, সৌরভ, বান্টি —সব্বাই ছেলেধরার কথা জিজ্ঞেস করল। অনেক ছেলেমেয়ে, সেধে সেধে এসে মিতুর সঙ্গে ভাব করল।

শনিবার তো স্কুল ছুটি। মা যাচ্ছেন ইলেকট্রিক বিল দিতে। মিতু বায়না ধরল, 'আমিও যাব মা।' মা একটু আপত্তি করলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা চলো। নইলে তুমি আবার দাদামণিকে বিরক্ত করবে পড়ার সময়।'

মন্টুদার দোকান থেকে মা আজ নিজে থেকেই একটা ফাইভ-স্টার কিনে দিলেন মিতুকে। আর কয়েক পা গেলেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস। লাইনে তিন চারজন দাঁড়িয়ে। মা মিতুকে নিয়ে লাইনে দাঁড়ালেন। মিতু যাবার সময়ই দেখেছে দরজার সিঁড়িতে সেই লোকটা বসে আছে — সেই ছেঁড়া সোয়েটার গায়ে। মিতু আস্তে আস্তে মার হাত ছাড়িয়ে লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বাড়িয়ে ধরল ফাইভ - স্টার। ওর খুব ভয় করছিল, লোকটা পাছে ফের বলে 'দশ পয়সা'। ওর কাছে তো দশপয়সা নেই। আর মা'র কাছে চাইতে গেলে হয়তো এসে দেখবে ও উধাও হয়ে গিয়েছে।

লোকটা ভ্রূ কোঁচকানো কপাল তুলে চাইল। তারপর ফাইভ-স্টার চকোলেটটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল। মিতুর মনে হ'ল ওর রাগী-রাগী চোখে যেন একটু হাসি চিক্‌চিক্ করছে।

ততক্ষণে মা'র বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মা এসে ওর হাত ধরে বললেন, 'পুরো চকোলেটটা একা খেয়ো না যেন, পেট খারাপ হবে। বাড়ি গিয়ে দাদামণির সঙ্গে ভাগ করে খাবে।' তারপর ওর হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী? এর মধ্যে খেয়ে ফেলেছ?' মিতু একগাল হেসে বলল, 'না, মা, দিয়ে দিয়েছি।'

'কাকে?'

'ওই ছেলেধরা-ধরাকে।'

ছবি : সঞ্জয় সরকার

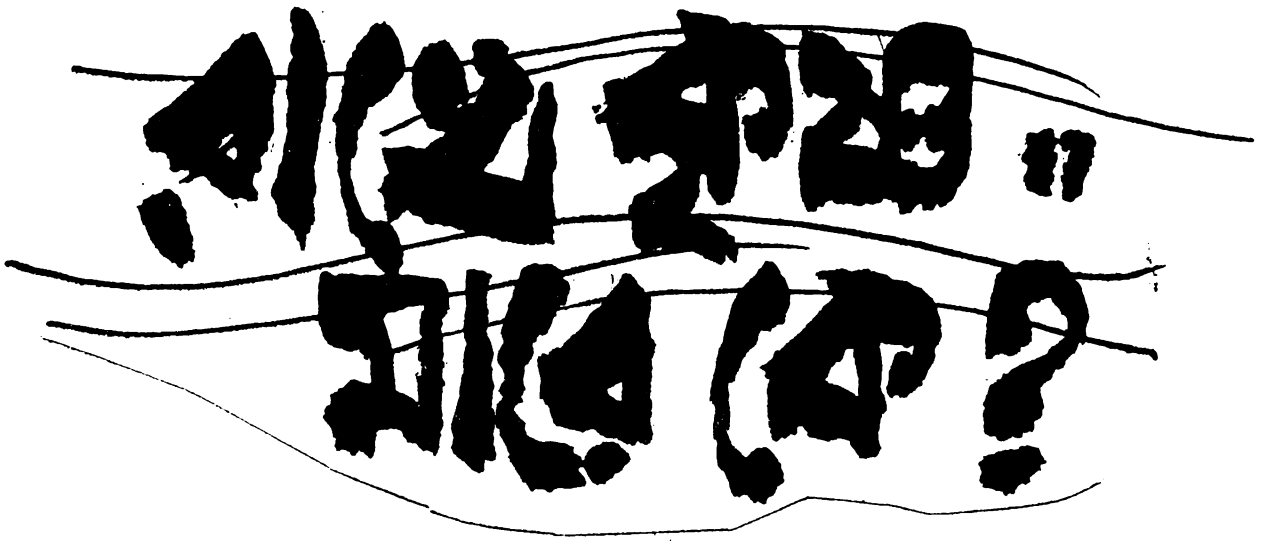

শোভেন সান্যাল

ঘটনাটা শুনেছিলাম সন্তোষদার কাছে। সন্তোষদা অর্থাৎ আমার দাদার বন্ধু সন্তোষ নিয়োগী। তখন তিনি থাকতেন কাটিহারে। রেলে কাজ করতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি, বিয়েথা করেননি। গরীব ঘরের ছেলে। অনেক কষ্টে ভাইবোনদের মানুষ করে তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজে একাই থাকতেন তখন।

কোনও নেশা ছিল না তাঁর। শুধু একটা শখ ছিল, রেলের পাস নিয়ে বছরে দু'-একবার হিমালয়ে ঘুরে বেড়ানো। হিমালয়ের কোথায় না গেছেন তিনি। কাঁধে একটা বড় ঝোলানো ঝোলায় তেল-গামছা, এক সেট ধুতি-পাঞ্জাবি, টুথব্রাশ, পেস্ট, মাথার সরষে তেল আর এক জোড়া কম্বল—একটা পেতে শোবার, একটা গায়ে চাপাবার। এই সম্বল করে তিনি হিমালয়ের দুর্গমতম অঞ্চলেও ঘুরে বেড়াতেন। অবশ্য গায়ে থাকত একটা উলিকটের ফুলহাতা গেঞ্জি, পাঞ্জাবির উপরে একটা সস্তা মোটা উলের ফুলহাতা সোয়েটার আর রেলের বহু পুরানো কালো কোট। পায়ে থাকত সুতির মোজার ওপর একটা সস্তা উলের মোজা আর তাঁর সর্বত্রগামী ক্যাম্বিসের জুতো। হ্যাঁ, হাতে একটা ছাতাও থাকত বটে। আগেকার দিনের বাঁকানো হাতলের মূলিবাঁশের হ্যান্ডেলের ছাতা। তা নাকি তাঁর লাঠিরও কাজ করত, আবার বৃষ্টিও আটকাত। ঝোলায় থাকত আরও কিছু খুচরো জিনিসপত্র—একটা ছোট নতুন ব্যাটারি লাগানো বহু পুরানো এভারেডি টর্চ, মোমবাতি, দেশলাই, দু-একটা প্রয়োজনীয় হোমিওপ্যাথি ওষুধপত্র, ইত্যাদি। এই নিয়েই তিনি রূপকুণ্ড, হেমকুণ্ড, নন্দনকানন, হরিদ্বার, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গোমুখ, যমুনোত্রী সব ঘুরেছেন। ইচ্ছে থাকলেও মানস সরোবর যেতে পারেননি। চীন সরকার তখন মানস যাত্রা বন্ধ করে রেখেছিল বলে। পরেও যাওয়া হয়নি বেশি বয়সের জন্য। চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক যোগ্যতার ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি।

হরিদ্বার, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, সন্তোষদাকে নেশার মতো টানত। তাই তিনি এগুলো যে কতবার ঘুরেছেন তা আর মনে রাখেননি। এই কেদারনাথেই সেই ঘটনাটি ঘটেছিল। সেবার মন্দির বন্ধ হবার আগে ক'দিন ধরেই তিনি কেদারনাথে ছিলেন। ভাবছিলেন পরদিন ভোরে নিচে নেমে আসবেন। সেদিন রাত্রে চটিতে শুনলেন কয়েকজন সাধুবাবা ঠিক করেছেন পরদিন ভোরে তাঁরা কেদারনাথ থেকে বেরিয়ে উপরের বরফের ভেতর দুর্গম শর্টকাট রাস্তা ধরে বদ্রীনাথ যাবেন।

বহুবার কেদারনাথে আসায় সন্তোষদাও এই দুর্গম রাস্তাটার খবর জানেন। কিন্তু কখনোই তাঁর এই রাস্তায় বদ্রীনাথে যাওয়া হয়নি। সঙ্গী পাওয়া যায়নি। বরফের ভেতর ওই রাস্তার কোনও নির্দিষ্ট পথরেখা নেই। রাস্তায় কোনও চটি তো দূরের কথা, জনবসতিও নেই। কিছু কিছু সাধুসন্ত এবং গুর্জর মেষপালকেরাই মাত্র এই পথের সন্ধান জানে। রাস্তা হারাবার ভয় পদে পদে। আর ওই বরফের রাজ্যে রাস্তা হারালেই নিশ্চিত বরফ সমাধি। কেউ তার খোঁজ পাবে না কোনও দিন। এত কঠিন এবং ভয়ংকর বলেই তিনি কখনও এই পথে যেতে পারেননি সঙ্গীর অভাবে। সাধুদের কথা শুনে তিনি ঠিক করলেন, এ সুযোগ ছাড়া হবে না কিছুতেই। সেবার একটু তাড়াতাড়ি পাহাড়ে বরফ পড়তে শুরু করায় সন্তোষদা ঠিক করেছিলেন সেবার আর বদ্রীনারায়ণে যাবেন না। অবশ্য গেলেও তিনি সাধারণ তীর্থযাত্রীর চলাচলের রাস্তাতেই যেতেন বাসে করে।

তবে তা অনেকটা ঘুরপথে হ'ত। কয়েকদিন সময় লাগত। ততদিনে আরও বরফ পড়ত। সাধুদের খবরে তাঁর মনে হ'ল বাবা বদরিবিশাল নিজেই তার সমস্যার সমাধান করে দিলেন। প্রতিবারই তিনি কেদারনাথ বদ্রীনাথ এক যাত্রাতেই দেখেন। এবারই হবে না ভেবেছিলেন। বাবার কৃপায় এবারও তাই হবে।

তিনি সাধুরদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সাধুরা তাঁকে প্রচুর বোঝাল এই দুর্গম পথে তাদের সঙ্গে না যাবার জন্য। তারা নিজেরাও জানে না, শেষ পর্যন্ত বদরি-বিশাল তাদের কপালে কি লিখে রেখেছেন। তবে তারা তো সন্ন্যাসী, তদের নিজেদের জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু বাবুজী তো সন্ন্যাসী নন। তিনি কেন এ রাস্তায় যাবেন? তাছাড়া এ রাস্তায় কেউ কারুর জন্য দাঁড়ায় না। একেবারে মহাপ্রস্থানের পথ। যে পারবে না সে সেখানে পড়ে থাকবে। কেউ তার জন্য পেছনে তাকাবে না। চলার ছন্দ বন্ধ করবে না। করলে তারও মৃত্যু অবধারিত। ওপরে আগেই বরফ পড়ায় সব গুর্জর

মেষপালকেরা নেমে এসেছে। পথ হারালে পথ দেখানোর কেউ নেই। আর রাতের আগে বদ্রীনাথে না পৌঁছলে আর কোনও দিন সেখানে পৌঁছানো যাবে না। অন্ধকারে বরফের ফাটলে পড়ে, নয় দিক ভুল করে পথে ঘুরেঘুরে শীতেই মরবে সবাই। বাবুজি যেন এ ভুল না করেন। কিন্তু বাবুজি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তারা বদরি-বিশালের মর্জি বলে রাজি হ'ল। কিন্তু পরিষ্কার করে তারা বাবুজিকে বুঝিয়ে দিল যে তিনি তাদের পেছনে যেতে পারেন। তবে তারা কিন্তু বাবুজির জন্য কোথাও দাঁড়াতে পারবে না। বদরি-বিশালের নাম করে তারা ভোররাতে বেরিয়ে যাবে। বাবুজি পারলে তাদের সঙ্গে যাবে। তবে রাতে আবার যেন ভেবে দেখেন।

আর ভেবে দেখা। সন্তোষদা পারলে তখনই রওনা দেন। চটিওয়ালা এবং ওখানকার পুরানো যাত্রীরা, পাণ্ডারা, যারা ততদিনে সন্তোষদার মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে তারা সবাই শুনে একযোগে নিষেধ করল তাঁকে ওই রাস্তায় যেতে। বিশেষ করে যখন সব গুর্জর মেষপালকেরাই নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। এই মেষ-পালকরাই বরফ গলতে শুরু করলে ভেড়া নিয়ে পাহাড়ের উঁচু দুর্গম উপত্যকায় চলে যায় কয়েক মাসের জন্য ভেড়া চরাতে। সঙ্গে নিয়ে যায় কিছু বাজরার আটা, লবণ আর লঙ্কা। কয়েক মাস বাদে উপরে বরফ পড়তে শুরু করেলই তারা আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। ততদিনে পালের ভেড়াগুলো বেশ নাদুসনুদুস হয় আর সংখ্যায়ও বাড়ে। এটাই এই গুর্জর মেষপালকদের পেশা। ভেড়াগুলো অবশ্য ওদের নিজেদের নয়, মালিকদের। আর বছর বছর ভেড়া চরাতে চরাতেই এই লোকগুলো হয়ে যায় হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলের অভিযাত্রীদের কাছে একমাত্র পথ প্রদর্শক। এই দুর্গম অঞ্চল এদের নখদর্পণে। তাই এই অঞ্চলের অভিযাত্রীদের কাছে এদের মূল্য অপরিসীম। আর তাই সবাই সন্তোষদাকে এদের নেমে আসার খবরটাকে বারবার গুরুত্ব দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা চলছিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তিনি ঠিক করেই ফেলেছেন এ সুযোগ ছাড়া হবে না। এই দুর্গম পথেই তিনি বাবা বদরি বিশালকে দেখতে যাবেন।

ভোররাতে সন্তোষদা বেরিয়ে পড়লেন সাধুদের পেছনে। কিন্তু ওপরে উঠতেই শুরু হ'ল বরফের রাজ্য। চারদিকে শুধু সাদা বরফ। প্রথম প্রথম অসুবিধা না হলেও ক্রমে ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন তিনি ক্রমশ সাধুদের থেকে পিছিয়ে পড়ছেন। মাঝে মাঝে সাধুরা বরফের বাঁকে হারিয়েও যাচ্ছিলেন। পরিষ্কার দিন, সূর্যের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তবে চোখে একটা কম দামী আইস গগলস্ পরে নিয়েছেন তিনি। রাতে কেদারনাথেই তিনি এটা কিনেছিলেন এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই। বরফের ওপরে সাধুদের পদচিহ্ন ধরে তাঁর এগিয়ে চলতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। মনে বেশ ফূর্তিও হচ্ছিল এই নতুন পথে এবার বদরি বিশালের ডাকে সাড়া দিতে পারছেন বলে।

কিন্তু তাঁর মনে এই ফূর্তি বেশিক্ষণ টিকল না। দুপুরের পরই ভীষণ কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেল। এত ঘন কুয়াশা যে নিজের পা-ই ভালো করে চোখে পড়ছিল না। সামনের সাধুরা তো অনেকক্ষণ আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এখন তাদের পদচিহ্নও অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর সামনে থেকে। তিনি আন্দাজে সামনে চলতে লাগলেন আর বাবা বদরি বিশালকে মনে মনে ডাকতে লাগলেন। এক সময় হাতের ঘড়িও আর না দেখতে না পেয়ে বুঝলেন চারদিকে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। রাত হয়ে গেছে এবং তিনি পথ হারিয়েছেন। অনেক দিন ধরে পাহাড়ে ঘুরেঘুরে তিনি এটা বুঝেছেন যে হতাশ হলেই সর্বনাশ। এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই হবে। পুরোপুরি অন্ধকার— একেবারে অন্ধের মতো তিনি সে চেষ্টাই করতে লাগলেন। তাঁর ছোট টর্চটা কোনও কাজেই এল না এই ঘন কুয়াশায়। কোথায় কোনও দিকে যাচ্ছেন তিনি তা জানেন না। কখনও বরফের চড়াই ভাঙছেন কখনও উৎরাই। কখন যে শীতের চোটে গায়ে দুটো কম্বলই জড়িয়ে নিয়েছেন জানেন না। এক সময় অন্ধকার কিসে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তনি বরফের উপরে। টর্চ, ছাতা, ঝোলা কোথায় ছিটকে পড়ল তাও দেখতে পেলেন না। ভাগ্য ভালো পথে কোনও বরফের ফাটল কি খাদ পড়েনি। হোঁচট খাবার পর কিছু দূর যেতেই বুঝতে পারলেন হাঁটুতে চোট লেগেছে। হাঁটা যাচ্ছে না। এবার তাঁকে বরফের উপরেই বসে পড়তে হ'ল। এতক্ষণে তিনি ভয় পেলেন— এই বরফের ওপর বসে থাকলে তা কী হতে পারে তা তাঁর জানা আছে। তাই দু'হাতে হাঁটু টিপতে টিপতে মনে মনে বদরি বিশালকে ডাকতে লাগলেন। এ ভাবে বেঘোরে বরফে নিখোঁজ হতে তার কিছুতেই মন চাইছিল না। বাবা বদরি বিশাল কি তাঁকে দয়া করবে না? হাঁটুর ব্যথায় এবং ভয়ে তার এই শীতেও চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। আর তখনই মনে হ'ল তাঁর থেকে কিছুটা নিচে একটু দূরে একটা আলো জ্বলে উঠল এই বরফের জমাট সমুদ্রে। সেই আলোটা একটা ছোট্ট তারার মতো কখনও নিভছে কখনও জ্বলছে। কিন্তু মোটামুটি একই জায়গাতে।

সন্তোষদা প্রথমে চমকে গিয়েছিলেন তুষার চিতার চোখের জ্যোতি মনে করে। তারা নাকি এই সব বরফের রাজ্যেই থাকে। প্রাণটা এবার তুষার চিতার থাবাতেই যাবে মনে করলেন তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, ওটা একটা ধুনির আলো নয়তো। সেই সাধুদের দলটা নয়তো?

সন্তোষদা উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় এবার তাঁর হাঁটুর ব্যাথাটার কথা খেয়ালই হ'ল না। তারপর কতক্ষণে আর কী ভাবে তিনি সেই আলোর উৎসের কাছে পৌঁছেছিলেন তা আর মনে নেই। এক সময় তিনি কিছু অশরীরী আওয়াজ শুনলেন এবং কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তুলোর মতো নরম কোনও কিছুর উপর।

তারপর আর তাঁর কিছুই মনে নেই।

এক সময় মনে হ'ল কেউ তাঁর সারা শরীরে কম্বল গরম করে সেঁক দিচ্ছে। আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখলেন একটা ভেড়ার চামড়ার পোষাক পরা লোক তাকে কম্বল গরম করে সেঁক দিচ্ছে। সন্তোষদাকে চোখ মেলতে দেখেই লোকটা একটি অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে খানিকটা গরম দুধ আস্তে আস্তে রাসে খাইয়ে দিল। ভেড়ার দুধ কি রকম একটা গন্ধ লাগল তাঁর নাকে। এবার তিনি উঠে বসলেন। তাদের মধ্যে ভাঙা ভাঙা দোহাতি হিন্দিতে কথা শুরু হ'ল।

সন্তোষদা সেই লোকটার কথা বুঝতে পারলেন, লোকটা একজন গুর্জর মেষপালক। সে অনেক দূর উঁচুতে চলে যাওয়ায় সময় মতো নামতে পারেনি। তার দেরি হয়ে গেছে। অন্যেরা সবাই নেমে গেছে। সেও আজ বদ্রীনাথে নেমে যাচ্ছিল। পথে ঘন কুয়াশায় পথ হারাবার ভয়ে আজ রাতটা এই বরফের উপরেই কাটাচ্ছে তাঁবু খাটিয়ে তার ভেড়াগুলোর সঙ্গে।

তিনি এবার তার তাঁবু দেখতে পেলেন। এক টুকরো ত্রিপল কোনও রকমে তিনকোণা করে ঝোলানো কয়েকটা ছোট লাঠির সাহায্যে। তার ভেতরেই তিনি এবং সেই লোকটা বসে আছেন। কোনও মতে এক জনের শুয়ে থাকার জায়গায় দু'জনে বসে আছে। সেই তাঁবুর মুখে আগুন জ্বলছে। শুকনো ভেড়ার নাদির আগুন। লোকটার কাছে জ্বালানী হিসাবে আছে কয়েক বস্তা এই ভেড়ার নাদি। এই জ্বালানি জ্বালিয়ে বাজরার রুটি সেঁকার জন্য লোকটা আগুন জ্বালিয়েছিল, আর সেই আগুনের শিখা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। হঠাৎ অচেনা লোকের সাড়া পেয়ে ভেড়াগুলোর ডেকে ওঠার শব্দ শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে একটা ভেড়ার পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। আর সেই ভেড়ার ডাক শুনেই তাঁবুর বাইরে এসে লোকটা অজ্ঞান অবস্থায় সন্তোষদাকে দেখতে পেয়ে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে এসে আগুনে কম্বল গরম করে সেঁক দিয়ে দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরায়।

সন্তোষদার সব কথা শুনে সে বলে—বাবা বদরি বিশালের অসীম কৃপা। বাবুজি তো উল্টো দিকে পাহাড়ের ওপরে বরফের রাজ্যে চলে যাচ্ছিলেন পথ ভুলে। ওদিকে আর একটু গেলেই আর বাবুজি বাঁচতেন না। বিশাল খাদে বরফ চাপা পড়তেন। কেউ জানতেও পারত না। কেউ আর এখন উপরে নেই। সব গুর্জর নিচে নেমে গেছে। বদরি বিশালজি বাবুজির জন্য তার এবার নামাটা দেরি করিয়ে দিয়েছেন। আর তাই কুয়াশায় তাঁকে এখানে তাঁবু ফেলিয়েছে। আর ঠিক এই সময়েই তার রুটি সেঁকার জন্য আগুন জ্বালাতে হয়েছে। তখনই কুয়াশাটাও দূর করে দিয়েছেন বদরি বিশালজী যাতে বাবুজি সেই আগুন দেখতে পান। অথচ তার আরও আগে রুটি খেয়ে আগুন আড়াল করে তাঁবুর মুখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ার কথা। আজ এখানে থাকার কথা নয় বলে তার রুটি বানাতে দেরি হয়েছে। 'জয় বদরি বিশালজি কি জয়'। তিনিই আজ বাবুজিকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। বাবুজি বহোৎ পুণ্যবান। তার বাজরার রুটির ভাগ নিয়ে তাকে কৃতার্থ করুন বাবুজি এখন। লোটা ভরা গরম ভেড়ার দুধও খাবেন বাবুজি। তারপর এই তাঁবুতে আগুনের গরমে ঘুমিয়ে পড়বেন। গরীবের এই তাঁবুতে তার সঙ্গে শুতে একটু কষ্ট হবে। তবে সকালে উঠে দেখবেন সব তাকত ফিরে পেয়েছেন বদরি বিশালজির কৃপায়। সে নিজে বাবুজিকে কাল বদরি বিশালজির মন্দিরে দিয়ে আসবে। তার রাস্তা থেকে একটু ঘুর পথ হলেও সে যাবে বাবা বদরি বিশালজিকে প্রণাম করতে। বাবা তাকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন এতো বহু পুণ্যের কাজ। বাবাকে কাল সে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবে সে।

পরদিন দুপুরের আগেই তারা বদ্রীনাথ পৌঁছে বাবা বদ্রীনাথকে প্রণাম করে এল। সন্তোষদাকে চটিতে পৌঁছে দিয়ে লোকটা তার ভেড়ার পাল নিয়ে চলে গেল। সন্তোষদার অনেক অনুরোধেও লোকটা তার কাছ থেকে একটা টাকাও নিতে রাজি হ'ল না। বদরি বিশালের যাত্রীর কাছ থেকে পথ দেখিয়ে টাকা নিলে তার পাপ হবে। বদরি বিশালজি রাগ করবেন। সরল পাহাড়ী সেই মেষ পালকের সরল ধর্ম-বিশ্বাসের কথা সন্তোষদা কোনও দিনও ভোলেননি। তিনি বলেছিলেন, 'দেখ, আমার সে রাতে নিশ্চিত মৃত্যু হত বরফের মধ্যে। কেউ জানতেও পারত না। কিন্তু বাবা বদরি বিশালজি তা চাননি। তাই ওই লোকটাকে যেন ওখানে ওই সময় রেখেছিলেন আমায় বাঁচানোর জন্য। অথচ সেই সাধুরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেদিন বদ্রীনাথে পৌঁছায়নি। ওখানে সবাই আমার কাছে সব শুনে বলল—ওরা ওই ভংয়কর কুয়াশায় নিশ্চয়ই পথ ভুলে বরফের রাজ্যে হারিয়ে গেছে। আমাকে ওভাবে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসায় বাবা বদ্রীনাথ ওদের ওপরে চটে গেছেন তাই আমি বাঁচলেও ওরা নিখোঁজ।

সাধুদের কথা বলতে পারব না। তবে বাবা বদ্রীনাথ বুঝি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

যবদ্বীপে মহাভারতের কাহিনী

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময়ে ভারতবর্ষের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। জাভা বা যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রা—এ সব জায়গায় হিন্দু ধর্মের বিস্তার ঘটে ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প এখানকার স্থানীয় লোককথার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। নানারকম রাজনৈতিক উত্থান পতনের মাঝেও এসব কাহিনী আজও খুঁজে পাওয়া যায়। এমন কি ষোলশ শতকে ইসলামে গণ ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও জাভায় হিন্দু ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। হিন্দু পুরোহিতরা সেকালে বিভিন্নভাবে, যেমন পামপাতার উপর, দেয়ালে অথবা পাথরের গায়ে খোদাই করে ইতিহাস মিশ্রিত সব কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। বালি দ্বীপেও হিন্দু ধর্মের নানা নজীর বর্তমানেও পাওয়া যায়। এ রকম বিচিত্র পথ ধরেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগোয়। এক দেশের আচার-কানুন হয়ত আর একে দেশে গিয়ে শিকড় গাড়ে।

যবদ্বীপবাসীরা তাদের নিজেদের মতন করে মহাভারতের নানা গল্প বলে। এ রকমই এক গল্প শোনাই আজ।

রাজকুমার অর্জুন ইন্দ্রকিলা পর্বতের উপর এক নির্জন গুহায় বসে একমনে তপস্যা করছিলেন। তাঁর একাগ্রতা দেখে দেবতারা বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা এমন একজন একনিষ্ঠ মানুষকে খুঁজছিলেন যে নাকি দুষ্ট দানবরাজ নিবাতকবচকে যুদ্ধে পরাজিত করবেন। কারণ দানবের অত্যাচারে স্বর্গমর্ত্য অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেবতারা বেশ পাকাবুদ্ধি ধরেন। তাঁর ঠিক করলেন অর্জুনকে পরীক্ষা করে দেখবেন আগে, যে সে এই গুরু দায়িত্ব পালনের উপযোগী কি না।

সাতজন সুন্দরী অপ্সরীকে দেবতারা পাঠালেন মর্ত্যে অর্জুনের তপোভঙ্গের জন্যে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সাত সুরসুন্দরী ইন্দ্রকিলা পর্বতের উপর বল্‌মলে পোশাক পরে নেমে এল। তারা অর্জুনের ধ্যান মগ্ন রূপ দেখে নিজেদের ভিতর শলা-পরামর্শ করতে লাগল কি করে তপস্যা ভঙ্গ করা যায়।

অর্জুন তাঁর গুহার ভিতর থেকে অপ্সরীদের দেখতে ও তাদের কথা শুনতে পেলেন। তাঁর কাছে এসে তারা নানাভাবে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেও অর্জুন তিলেক নড়লেন না, স্থির হয়ে রইলেন যদিও অপ্সরী সুপ্রভাকে তাঁর খুব ভালই লাগল।

শেষ পর্যন্ত সুরসুন্দরীরা হার মেনে হতাশ হয়ে দেবলোকে ফিরে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে সব কথা বলল। সব শুনে টুনে ইন্দ্র ঠিক করলেন তিনি নিজেই অর্জুনকে পরীক্ষা করতে যাবেন। তারপর এক গরীব পুরোহিতের রূপ ধারণ করে অর্জুনের কাছে এসে বলতে শুরু করলেন, 'হে তরুণ তাপস, তুমি কেন তোমার অস্ত্রশস্ত্র তপস্যার সময়ে তোমার কাছে রাখো? এ জগৎ থেকে মুক্তি পেতে গেলে এ সব ত্যাগ কর।'

অর্জুন সৌজন্যপূর্ণ উত্তর দিলেন, 'পূজনীয় ব্রাহ্মণ, আমি এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। আমি কেবল শক্তি প্রার্থনা করি। সেটাই আমার ধর্ম।'

দেবরাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন। আর ঠিক তখনই অর্জুন খেয়াল করলেন যে দুষ্ট দানবরাজ নিবাত কবচের সেনাপতি মামাং মুর্কা (Mamang Murka) তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। আর মামাং মুর্কা এসেছে এক বরাহের মূর্তি ধরে। বীর অর্জুন তপস্যা ছেড়ে তখুনি ধনুক তুলে শূওরটা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন আর এমন

অদ্ভুত সে অন্য দিক থেকে আর একজন সুবেশ শিকারীও শূওরটাকে তীরবিদ্ধ করল।

অর্জুন রাজোচিতস্বরে বললেন, 'এ বরাহটা আমার।' কিন্তু ব্যাপারটা হল এই যে ওই শিকারীর তীরই বরাহের বুকের ভিতর গেঁথে গিয়েছিল, তাই কে সেটাকে মারল সেটা কিছুতেই সাব্যস্ত করা গেল না। তর্ক-বিতর্কে অর্জুনের রাগ গেল বেড়ে। তিনি ব্যাধকে বললেন, 'তোমার তীর ধনুকের কেমন শক্তি আমায় দেখাও দেখি।'

তখন সেই ব্যাধ বিদ্যুতের গতিতে একের পর এক তীর ছুঁড়তে লাগল। অর্জুন ব্যাধের পা ধরে টেনে ফেলে দেবার চেষ্টা করে পারলেন না। তখন অর্জুন বুঝতে পারলেন ব্যাধ আর কেউ নন স্বয়ং ভগবান (Bathara Gura)। অর্জুন মার্জনা চেয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। ভগবান খুশী হয়ে তাঁকে এক মায়া তীর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এবার অর্জুনের ডাক পড়ল স্বর্গলোকে। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে বললেন, 'তোমার বীরত্বে আমি সন্তুষ্ট। আমি চাই তুমি দৈত্য নিবাতকবচের উপর লক্ষ্য রাখো। তুমি এ কাজে সঙ্গী পাবে সুন্দরী সুপ্রভাকে।'

অর্জুন খুশী হয়ে 'যথা আজ্ঞা' বললেন। তিনি সুপ্রভাকে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে চললেন নিবাতকবচের রাজ্যের দিকে। সেখানে চোখে পড়ল অজস্র ভাঙাচোরা মন্দির আর ঘরবাড়ি। সেখানে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা দেখলেন, নিবাতকবচকে ঘিরে রেখেছে বসু সুন্দরীরা। সুপ্রভার সঙ্গে পরামর্শ করলেন অর্জুন, তারপর প্রাসাদের বাগানে ফটকের কাছে লুকিয়ে রইলেন আর সুপ্রভা একা এগিয়ে গেল।

সুপ্রভার রূপে একেবারে মুগ্ধ হয়ে নিবাতকবচ বিয়ে করতে চাইলে সুপ্রভা বীণার মত মিষ্টি সুরে বলল, 'বেশ বিয়ে করতে পারি কিন্তু একটি শর্তে। দৈত্যরাজ, তোমাকে বলতে হবে তোমার অপরাজেয় হবার গোপন কথাটি।'

নিবাতকবচ তখন বিয়ে করার জন্যে অস্থির। সাতপাঁচ না ভেবে সরলভাবে বলে দিল, 'আমাকে দেবতা বা দানব কেউই মারতে পারবে না। কিন্তু যদি কোন মানুষ আমার জিভে তীর মারে তবে তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হবে।'

অর্জুন এবার ফটকের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে দৈত্যরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। মুহূর্তে অযুত-নিযুত সংখ্যক দানবসেনা জড়ো হয়ে গেল। তারা অর্জুনকে উল্টে ফেলে দিলে তিনি মরে যাবার ভান করলেন। তারপর বোকাদানবদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ত্বরিতে নিবাতকবচের জিভের ভিতর তীর মেরে তাকে ধ্বংস করলেন।

স্বর্গলোক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। অর্জুন সুপ্রভাকে বিয়ে করে সাত মাস স্বর্গলোকে বাস করার পর আবার মর্ত্যে ফিরে এলেন।

ছবি : হর্ষমোহন চট্টরাজ

বাস পাঠালাম

যতীন্দ্রমোহন মজুমদার

এপার বাংলা, ওপার বাংলা,
মাঝখানে এক খাল
শখ করে সেই খালটা কেটে
বাঙালীর এই হাল।
খাল আমাদের কাল হ'ল ভাই,
আপন হ'ল পর
বানের তোড়ে ডুবল ভিটা,
ভাসল সাধের ঘর।
বান ডাকা খাল উথাল-পাথাল,
দুই পারে ভাই-বোন
ভাইয়ের কান্না বোনের কান্না
কান পেতে ওই শোন।
আর কেন ভাই কান্নাকাটি
আর কেন সেই ভুল?
এস না ফের এপার ওপার
গড়েই তুলি পুল।
রহিম চাচা, রমেন কাকা
সকল বোনও ভাই,
বাস পাঠালাম ফেরত বাসে
সবার আসা চাই।
ফিরতি বাসে আমিও যাব,
আগাম জানালাম
ওযে আমার সোনার বাংলা
আমার তীর্থধাম।

মজার ছোট দিনগুলি

জয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

(বিদেশী গল্পের ছায়া-অবলম্বনে)

সেই রাত্তিরেই গার্গী ঘটনাটা তার ইলেকট্রনিক ডায়েরীতে তুলে রেখেছিল। ডায়েরীর ছোট্ট স্ক্রীনের ওপর দিকে সেদিনের তারিখ দেওয়াছিল ১৭ই মে, ২২৫৭। সে এন্ট্রি করেছিল এই ক'টি কথা—'আজ বিক্রম একটা সত্যিকার আসল বই খুঁজে পেয়েছে!'

বইটা ছিল খুবই পুরোনো। গার্গীর ঠাকুর্দা একবার বলেছিলেন, তিনি যখন খুব ছোট তখন তাঁর ঠাকুর্দার মুখে শুনেছিলেন যে একটা সময় ছিল যখন গল্প নাকি কাগজের ওপর ছাপা হতো।

ওরা হলদে হয়ে যাওয়া ভাঁজ পড়া পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখছিল। সত্যিই কী অদ্ভুত! পাতার ওপর লেখাগুলো সরে সরে না গিয়ে একদম স্থির হয়েছিল। স্ক্রীনের ওপর যেভাবে লেখাগুলো নড়াচড়া করে বা সরে যায় এখানে তা না হওয়ায় ওদের ভীষণ মজা লাগছিল। আর তারপর ওরা যখন আগের পাতাটা আবার উল্টে দেখল, ভারী আশ্চর্য হলো একটু আগে ওরা যা পড়েছিল ওতে তখনো ঠিক তাই-ই লেখা আছে!

বিক্রম বলল, 'আগেকার দিনের লোকগুলো কী বোকা ছিল! পড়া শেষ হলেই তো বইটা ফেলে দিতে হবে। কী অপচয়! আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রীনে হাজার হাজার গল্প পড়া যায় আর তাছাড়া আরো কত কিছুই না ওখানে দেখা যায়। আমি কক্ষনো ওটা ফেলে দেবো না।'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বিক্রম তার মত প্রকাশ করল। ওঁর বাবাও টেলিভিশনের খবর শুনতে শুনতে এইভাবে মাথা নাড়িয়ে তাঁর মতামত দিয়ে থাকেন। বিক্রমের বয়স তেরো, কিন্তু এগারো বছরের গার্গী ওকে বেশ কিছুটা সমীহ করে চলে। তাছাড়া, বিক্রমের যত গল্প জানা আছে গার্গী অত গল্প এখানে পড়েনি।

গার্গী বলল, 'ঠিক'। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলিরে এটা?'

'আমাদের বাড়িতে।' চোখ না তুলেই হাত দিয়ে এক দিক দেখাল কারণ ততক্ষণে ও আবার বইটা পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'ছাতের ঘরটাতে।'

'এটা কী নিয়ে লিখেছে?'

'স্কুল।'

গার্গী খুব বিরক্ত হলো। 'স্কুল? স্কুল নিয়ে কেউ লেখে নাকি? আমি স্কুলকে ঘেন্না করি।'

গার্গী বরাবররই স্কুলকে ঘেন্না করত। ইদানিং এই ঘেন্নাটা বেশ বেড়েছে। তার কারণও আছে। সম্প্রতি ওর যান্ত্রিক শিক্ষক ভূগোলে একের পর এক পরীক্ষা নিয়েই চলেছে আর পরীক্ষার ফল গার্গীর ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। ব্যাপার স্যাপার দেখে ওর মা ঘাবড়ে গেলেন আর বাবার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন মেয়ের ভবিষ্যতে নিয়ে। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে গার্গীর বাবা পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধের মতামত দিলেন। উপায়ন্তর না দেখে মা ডেকে পাঠালেন স্থানীয় শিক্ষা-সংস্থার

পরিদর্শক মশাইকে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বড়সড়ো বাক্স হাতে তিনি এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোক ছোটখাট গোলগাল চেহারার মানুষ, মাথায় প্রকাণ্ড এক চকচকে টাক। টাকাটি তিনি রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুছছিলেন। গার্গীকে দেখে তিনি হাসলেন আর একটা চকোলেট তার হাতে দিলে। বাক্সটার মধ্যে কি আছে সেটা জানার জন্য গার্গীর খুব কৌতূহল হচ্ছিল। তার যান্ত্রিক শিক্ষকের সামনে তিনি বাক্সটা রেখে তার ঢাকনাটা খুলতে সে দেখল সেটা নানারকম যন্ত্রপাতি, তার, ডায়াল ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি। তিনি তার থেকে কয়েকটা যন্ত্র বেছে নিয়ে সেগুলোর সাহায্যে যান্ত্রিক শিক্ষককে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেললেন। গার্গী চাইছিল ওটা যাতে আর না জুড়তে পারা যায়। কিন্তু দেখা গেল ভদ্রলোক বেশ ওস্তাদ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওটা যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল—আগের মতনই বেজায় বড়ো, কালো আর বিশ্রী।

গার্গীর খুব রাগ হচ্ছিল ভদ্রলোকের ওপর। ওটা জুড়বার কি দরকার ছিল? ওর সঙ্গে একটা বিরাট স্ক্রীন লাগানো রয়েছে যার সাহায্যে যান্ত্রিক শিক্ষক পাঠ্য বিষয়গুলি দেখায় আর নানান প্রশ্ন করে। এটাও ততটা খারাপ নয়, কিন্তু গার্গীর যেটা সবচেয়ে অপছন্দের তা হলো স্ক্রীনের সঙ্গে লাগানো একটা খোপ, যার মধ্যে তাকে বাড়ির কাজ আর পরীক্ষার খাতা জমা দিতে হয়। যান্ত্রিক শিক্ষক তক্ষুণি হিসেব করে নম্বর বসিয়ে দেয় একটুও সময় নষ্ট না করে।

কাজ শেষ হলে রুমাল দিয়ে টাকটা মুছে পরিদর্শক মশাই হাসি হাসি মুখ করে গার্গীর মাথাটা আদর করে নাড়িয়ে দিলেন, তারপর তার মাকে বললেন, 'আপনার এই ছোট্ট মেয়েটির কোনো দোষই নেই মিসেস সেন। আসলে, যান্ত্রিক শিক্ষকের ভেতর ভূগোলের অংশটা একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। এমনটা মাঝে মধ্যে হয়। আমি ওই অংশটার গতি কমিয়ে গড়পড়টা দশবছর বয়সীদের মানের সমান করে দিয়েছি। সত্যি বলতে, আপনার মেয়ের সামগ্রিক অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক।'

ভদ্রলোকের কথায় মিসেস সেন আশ্বস্ত বোধ করলেও গার্গী খুব হতাশ হয়েছিল। ও আশা করেছিল উনি তার শিক্ষককে একেবারে নিয়েই চলে যাবেন। ওরা একবার বিক্রমের শিক্ষককে প্রায় এক মাসের জন্য নিয়ে গিয়েছিল কারণ তার ভেতরের ইতিহাসের অংশটা কিভাবে যেন সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। সেটা বেশিদিনের কথা নয়, তাই গার্গীর স্পষ্ট মনে আছে। ওই এক মাস বিক্রমকে একটাও পরীক্ষা দিতে হয়নি। গার্গীর তখন বিক্রমকে কি হিংসেই না হতো।

তাই সে বিক্রমকে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল নিয়ে কেউ লিখতে যাবে কেন?'

বিজ্ঞের মত বিক্রম ওর দিকে তাকাল। 'কারন এটা আমাদের মতন স্কুল নয়রে, বোকা। এ হলো পুরনো ধরনের স্কুল—অনেক অনেক শ' বছর আগে ছিল।' তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বেশ ভারিক্কীচালে কাটা কাটা উচ্চারণে ও যোগ করল, 'বহু-শতাব্দী-আগে।' এই শব্দটা বিক্রম সম্প্রতি শিখেছে।

বিক্রমের কথায় গার্গী ক্ষুন্ন হলো। 'এতদিন আগে স্কুল কী ধরনের ছিল তা আমি জানব কেমন করে?' বিক্রম কোনো উত্তর দিল না। গার্গীর কৌতূহল বাড়তে লাগল; ও বিক্রমের কাঁধের ওপর দিয়ে বইটা কিছুটা পড়ল, তারপর বলল, 'যাই বলিস, ওদেরও শিক্ষক ছিল।'

'সে তো ছিলই, কিন্তু সাধারণ শিক্ষক নয়। তখন শিক্ষক ছিল মানুষ।'

'মানুষ? মানুষ কী করে শিক্ষক হতো?'

'সে ছেলেমেয়েদের নানান জিনিস শেখাত, বাড়ির কাজ দিত আর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত।'

'মানুষে এত চালাক হয় না।' গার্গীর দু'চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'নিশ্চয়ই হয়। আমার শিক্ষক যা জানে আমার বাবাও তাই জনেন।'

'হতেই পারে না। মানুষ কখনো শিক্ষকের মত অত কিছু জানতে পারে না।'

'খুব পারে। আমি বাজি রাখতে পারি।'

বিক্রম যখন দৃঢ়ভাবে তার মতামত দেয় গার্গী সাধারণতঃ তা মেনে নেয়। বিক্রম যে ওর থেকে বেশি জানে সেটাও মনে মনে স্বীকার করে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। বিক্রমের কথা ওর ঠিক মনঃপূত না হলেও কথাটার প্রতিবাদ না করে ও শুধু বলল, 'একটা অজানা লোক আমার বাড়িতে থাকবে আমায় পড়ানোর জন্য এ আমি মোটেও চাইব না।'

বিক্রম গার্গীর কথা শুনে হেসে শুনে হেসে লুটিয়ে পড়ল। 'ইস্ কী বোকা তুই গার্গী। কিছু জানিস না তুই। তখন শিক্ষকরা বাড়িতে থাকত না। তাদের জন্য একটা বিশেষ বাড়ি থাকত আর ছোটরা সবাই সেখানে পড়তে যেত।'

'আর, সব বাচ্চারা একই জিনিস শিখত?'

'নিশ্চয়ই, যদি তারা একই বয়সী হতো।'

'কিন্তু আমার মা বলেন, যাকে সে শেখাচ্ছে সেই ছেলে বা মেয়ের মনের সঙ্গে শিক্ষককে সঙ্গতিপূর্ন হতে হবে। সেজন্যই সব ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা শিক্ষক হওয়া উচিত।'

'তা যাই হোক, তখন তা হতো না।' বিরক্তির সুরে বিক্রম বলল, 'তোর যদি সেটা পছন্দ না হয় বইটা না-ই পড়লি।'

'আমি তো বলিনি পছন্দ করি না। রাগ করছিস কেন?' গার্গী তাড়াতাড়ি বলে উঠল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওই সব মজার স্কুল সম্পর্কে আরো জানতে। নিবিষ্ট চিত্তে ওরা বইটা পড়তে লাগল।

যখন বইটা তাদের অর্ধেকও পড়া হয়নি তখন গার্গীর মা ডাকলেন, 'গার্গী! স্কুল।'

গার্গী মুখ তুলে তাকাল। অনুনয়ের স্বরে বলল, 'লক্ষ্মী মামনি, আর একটু পরে।'

'না, এখনই।' গম্ভীর স্বরে বললেন মিসেস সেন।' আর বিক্রমেরও বোধ হয় স্কুলের সময় হয়েছে।'

অনিচ্ছার সঙ্গে বইটা ছেড়ে উঠতে উঠতে গার্গী বিক্রমকে বলল, 'স্কুলের পর বইটা আমায় আরেকটু পড়তে দিবি তো?'

'দেখা যাবে।' তেমন উৎসাহ না দেখিয়েও বলল। তারপর ধূলোভর্তি পুরনো বইটা বগলের তলায় নিয়ে শিস্ দিতে দিতে চলে গেল।

গার্গী স্কুলঘরে ঢুকলো। এটা ওর শোবার ঘরের ঠিক পাশে। যান্ত্রিক শিক্ষক সেখানে চালু অবস্থায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। শনি ও রবিবার ছাড়া রোজ ঠিক একই সময়ে স্কুল শুরু হয় কারণ ওর মা বলেন, 'নিয়মিত একই সময়ে পড়ালেই ছোট ছেলেমেয়েরা বেশি তাল শিখতে পারে।

পর্দা আলোকিত হয়ে উঠল আর তাতে লেখা ফুটে উঠল, 'আজ অঙ্কের পাঠ—ভগ্নাংশের যোগ। সঠিক খোপে গতকালের বাড়ির কাজ ঢুকিয়ে দাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী তাই করল। সে তখন ভাবছিল সেই সব পুরানো স্কুলের কথা যেগুলো তার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা যখন ছোট ছিলেন সেই সময়কার। আশপাশের সমস্ত বাচ্চারা আসতো, স্কুল প্রাঙ্গণে সবাই মিলে হৈ-চৈ করত, হাসত, স্কুলরুমে একসঙ্গে বসে পড়া শুনতো আর দিনের শেষে একসঙ্গে বাড়ি ফিরত। তারা একই জিনিস শিখত, আর তাই বাড়ির কাজে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারত আর এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করত তারা।

আর শিক্ষকরা ছিল মানুষ....

যান্ত্রিক শিক্ষক পর্দায় ততক্ষণে লিখতে শুরু করেছে! 'যখন আমরা আর ভগ্নাংশের যোগ দিই—'

গার্গী এসব কিছুই দেখছিল না। ও তখন ভাবছিল, সেই আগের দিন গুলোয় বাচ্চারা নিশ্চয়ই স্কুলকে ভীষণ ভালবাসত। ও ভাবছিল, তাদের কী মজাই না ছিল তখন।

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সংলাপ

সংঘমিত্রা কর

সাপ কয়, 'ব্যাঙ রে,
খাব তোর ঠ্যাং রে।
দিনরাত লাফালাফি
মাঠ জুড়ো দাপাদাপি—
মারতে শেখাবি নাকি বোম্বাই ল্যাং রে?'

ব্যাঙ কয়, 'সাপ গো,
কি করেছি পাপ গো!
দিব্যি তো পা ছাড়াই
ঘোরোফের সাঁই সাঁই—
বৃথা বাহানায় কেন কর ডিসটার্ব গো?'

সাপ বলে, 'ওরে ব্যাঙ, রেখে দে ঘ্যাঁওর ঘ্যাঁং
এই দ্যাখ চকচকে
চেরা জিভ লক্‌লকে—
ছুঁড়ব এখনই তোকে ভীষণ এ বুমেরাং।'

ব্যাঙ বলে ওগো সাপ
এই বেলা কর মাপ
তাই শুনে ঠোঁটে চেটে
সাপ তাকে নিল পেটে—
শেষ হল মাঝপথে মধুর সে সংলাপ।

খ্যাঁকশিয়ালির গল্প

সুনির্মল চক্রবর্তী

খ্যাঁকশিয়ালি মুরগি চুরি করে বাড়ি ফিরছিল। দৌড়তে দৌড়তে কখন যে সন্ধে নেমে এল, তা বুঝতেই পারল না। ভ্যাগিস কিছুদূর যাবার পরেই একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল, তাই রক্ষে! কাছে এসে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল, কয়েকটা লোক খোশমেজাজে গল্প করছে।

মাথা নীচু করে খ্যাঁকশিয়ালি বললে, 'শুভ সন্ধ্যা, আপনাদের।'

'খ্যাঁকশিয়ালি তোমাকেও।'

'রাতটুকুর জন্য কি ভিতরে আসত পারি?'

'খ্যাঁকশিয়ালি বোন, তা কী করে হয়? দেখছ না ঘরগুলি কত ছোটো ছোটো, আমরা কোনোরকমে মাথা গুঁজে আছি। তোমাকে শুতে দেবার জায়গা একদম নেই।'

'বুঝলাম। আমার জন্য ভাবতে হবে না। বেঞ্চের তলাটুকু দিলেও আমার হবে। ওখানেই গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ব। একটা রাত এভাবেই কেটে যাবে।'

বাড়ির লোকেরা বললে, 'বেশ, তাহলে থাকো।'

'কিন্তু কোথায় আমার মুরগীটাকে রাখি?'

'উনুনের নীবে রাখলেই চলবে।'

মুরগীটাকে উনুনের নীচে রেখে শুয়ে পড়ল খ্যাঁকশিয়ালি। তার পর মাঝরাতে উঠল চুপিচুপি। মুরগীটাকে খেয়ে ফেলল আর পালকগুলিকে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখল।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মুখটুখ ধুয়ে এসে বাড়ির সব্বাইকে সুপ্রভাত জানাল। তারপরেই বলল, 'আমার মুরগীটা যেন কোথায়?'

'ওই তো ওখানেই হবে।'

'দেখছি না তো এখানে!'

তক্ষুনি সে মাটিতে বসে পড়ল আর কাঁদতে শুরু করল।

'থাকার মধ্যে ওই মুরগীটাকে ছিল আমা। সেটাও এখন নেই। বিনিময়ে কিছু দিতেই হয় তো, তোমাদের একটা পাতিহাঁস দাও।'

কিছুই করার নেই, একটা পাতিহাঁস তাকে দিতেই হল।

পাতিহাঁসটিকে থলেয় পুরে, তক্ষুনি সে ছুট দিল।

সন্ধে হয় হয়।

ছুটতে ছুটতে সামনে আবার একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। দরজায় উঁকি দিয়ে বললে, 'শুভসন্ধ্যা, আপনাদের।'

'তোমাকেও শুভসন্ধ্যা শেয়ালিদিদি।'

'একটা রাতের জন্য কি থাকতে দেবে?'

'আমাদের ঘর যে বড্ড ছোটো। তোমার থাকার মতো বাড়তি কোনও ঘর নেই।'

'আমার জন্য মোটেই ভেবো না। বেঞ্চটার নীচে গুটিশুটি হয়ে আমি থাকতে পারব। একটা রাত এভাবেই কেটে যাবে।

'বেশ তা হলে থাকো।'

'কিন্তু কোথায় আমার পাতিহাঁসটাকে রাখি?'

'গোলাবাড়িতে আমাদের রাজহাঁসগুলোর সঙ্গে।'

গোলাবাড়িতেই সে রেখে এল পাতিহাঁসকে। মাঝরাতে উঠল চুপিচুপি। তারপর পাতিহাঁসটাকে খেয়ে ফেলল। আর পালকগুলিকে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখল।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মুখহাত ধুয়েটুয়ে বাড়ির সব্বাইকে সুপ্রভাত জানাল। তারপরই বললে, 'আমার হাঁসটা যেন কোথায়?'

'গোলাবাড়িতে।'

গোলাবাড়িতে খোঁজা হল—নেই।

'মনে হচ্ছে আমাদের রাজহাঁসগুলোর সঙ্গে বেরিয়েছে।'

তক্ষুনি শেয়ালি কান্না শুরু করল।

'থাকার মধ্যে ওই হাঁসটাই ছিল আমার। সেটাই এখন নেই। বিনিময়ে যদি কিছু দিতেই হয় তো একটা রাজহাঁস দাও।'

কিছুই করার নেই যখন তারা আর কী করে, নাছোড়বান্দা শেয়ালিকে তারা একটা রাজহাঁসই দিয়ে দিলে।

থলেয় রাজহাঁসটিকে পুরে তক্ষুনি সে ছুট্ দিল।

সন্ধে হল। ছুটতে ছুটতে সামনে আবার একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। দরজায় উঁকি দিয়ে বললে, 'শুভসন্ধ্যা আপনাদের।'

'তোমাকেও শুভসন্ধ্যা শেয়ালিদিদি।'

'একটা রাতের জন্য কি থাকতে দেবে?'

'আমাদের ঘর যে বড্ড ছোটো। তোমাকে দেবার মতো বাড়তি কোনও ঘর নেই।'

'আমার জন্য মোটেই ভেবো না। এক কোনে গুটিশুটি হয়ে থাকতে পারব। একটা রাত এভাবেই কেটে যাবে।'

'বেশ তাহলে থাকো।'

'কিন্তু কোথায় আমার রাজহাঁসটাকে রাখি?'

'গোলাবাড়িতে। আমাদের মেষশাবকগুলির সঙ্গে।'

গোলাবাড়িতেই সে রেখে এল রাজহাঁসকে। মাঝরাতে উঠল চুপিচুপি। তারপর রাজহাঁসটাকে খেয়ে মুখটুখ মুছে পালকগুলিকে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখল।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মুখহাত ধুয়ে বাড়ির সব্বাইকে সুপ্রভাত জানাল। তারপরই বললে, 'আমার রাজহাঁসটা যেন কোথায়?'

'গোলাবাড়িতে।'

গোলাবাড়িতে খোঁজা হল,—নেই।

শেয়ালি কাঁদতে শুরু করল। 'এরকম ঘটনা আগে কখনও হয়নি। থাকার মধ্যে ওই রাজহাঁসটাই ছিল আমার। সেটাই এখন নেই।'

ঘরের কর্তা বললে, 'কে জানে হয়তো মেষশাবকদের পায়ের চাপেই রাজহাঁস তোমার মারা পড়েছে।'

'হতে পারে। বিনিময়ে যদি কিছু দিতেই হয় তো একটা ভেড়ার বাচ্চা দাও।'

শেয়ালি নাছোড়বান্দা।

কিছুই করার নেই, একটা ভেড়ার বাচ্চা তাকে দিতেই হল। থলেয় ভেড়ার বাচ্চাটাকে পুরে তক্ষুনি সে ছুট দিল।

সন্ধে হয় হয়।

ছুটতে ছুটতে সামনে আবার একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। কাছে এসে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল কয়েকটা লোক খোশমেজাজে গল্প করছে। দরজায় উঁকি দিয়ে বললে।

'শুভসন্ধ্যা আপনাদের।'

'তোমাকে শুভসন্ধ্যা শেয়ালিদিদি।'

'একটা রাতের জন্য কি থাকতে দেবে?'

'আমাদের ঘর বড্ড ছোটো। তোমাকে দেবার মতো আলাদা কোনও ঘর নেই।'

'আমার জন্য মোটেই ভেবো না। এক কোণে গুটিশুটি হয়ে থাকতে পারব। একটা রাত এভাবেই কেটে যাবে।'

'বেশ তাহলে থাকো।'

'কিন্তু আমার ভেড়ার ছানাটাকে কোথায় রাখি?'

'ওটা উঠোনেই রেখে দাও।'

তাই করল সে। মাঝরাতে উঠল চুপিচুপি। তারপর ভেড়ার ছানাটাকে খেয়ে শেষ করল।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মুখখানা ধুয়ে, হেসে হেসে বাড়ির সব্বাইকে সুপ্রভাত জানাল। তারপর বললে, 'আমার ভেড়ার ছানাটা যেন কোথায়?'

'কেন, উঠোনেই হবে।'

উঠোনে খোঁজা হল,-নেই।

তক্ষুনি শেয়ালি কাঁদতে শুরু করল।

'এরকম ঘটনা আগে কখনও হয়নি। কত জায়গায় তো কত রাত কাটিয়েছি। থাকার মধ্যে ওই ভেড়ার ছানাটাই ছিল আমার। সেটাই এখন নেই।'

ঘরের কর্তা বললে, 'মনে হচ্ছে আমার বউ বলদগুলিকে মাঠে চরতে পাঠাবার সময় ভেড়ার ছানাটাকেও ভুলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শেয়ালি নাছোড়বান্দা। 'হতে পারে। তবে তার বদলে আমাকে তোমার বউমাকে দিতেই হবে।'

শেয়ালির কতা শুনে ঘরের সব্বাই কাঁদতে লাগল, তার ছেলেপুরেরা, নাতি-নাতনিরাও কাঁদতে লাগল।

কিন্তু কাঁদলে কী হবে? ঘরের বউকে বস্তায় পুরে ফেলল সে। বস্তাটাকে রেখে একটু বাইরে গেল। তক্ষুনি ঘরে কর্তা বুদ্ধি খাটাল। বউকে বস্তা থেকে বের করে তার বদলে একটা নেড়িকুকুর বস্তায় পুরে দিল।

শেয়ালি ফিরে এসেই বস্তা ওঠাল কাঁধে, তারপর সেটাকে নিয়ে চলল। গান গাইতে লাগল গুনগুন :

মুরগী খেয়ে পেলাম পাতি
তাইরে নাইরে না,
পাতি খেয়েও রাজহাঁস পেলাম
তাইরে নাইরে না,
রাজহাঁস খেয়ে ভেড়ার ছানা
তাইরে নাইরে না,
ভেড়া খেয়েও বউ যে পেলাম
তাইরে নাইরে না।

বস্তায় সামান্য নড়াচড়া হতেই ভেতর থেকে কুকুরের আওয়াজ এল গর্ র্ র্ র্.....। শেয়ালি মনে মনে বললে, বউটা দেখছি ভয়েই মরছে। কুকুরের মতো আওয়াজ করার কি কোনও মানে আছে? একবার দেখা উচিং বউটাকে।

বস্তায় মুখ খুলতেই লাফ মারল কুকুর। তার পর চেঁচিয়ে উঠল—ঘেউ, ঘেউ।

শেয়ালি ভয়েই দে ছুট্। কুকুরও ছাড়বার পাত্র নয়। সে-ও দৌড়তে লাগল। শেয়ালি বনের গভীরে ঢুকে পড়ল। কুকুর তার পেছনে। শেষ, পর্যন্ত শেয়ালি তার বাসা খুঁজে পেল আর সেখানেই লুকিয়ে পড়ল।

কুকুর গর্তের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সে তো আর গর্তে ঢুকতে পারে না। গর্তে ঢুকে শেয়ালি এবার নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগল।

নিজের কানদুটোকে বললে, 'ছোট্ট দুটি কান আমার! বলো তোমরা কেন তখন থেকে পালাতে চাইছিলে?'

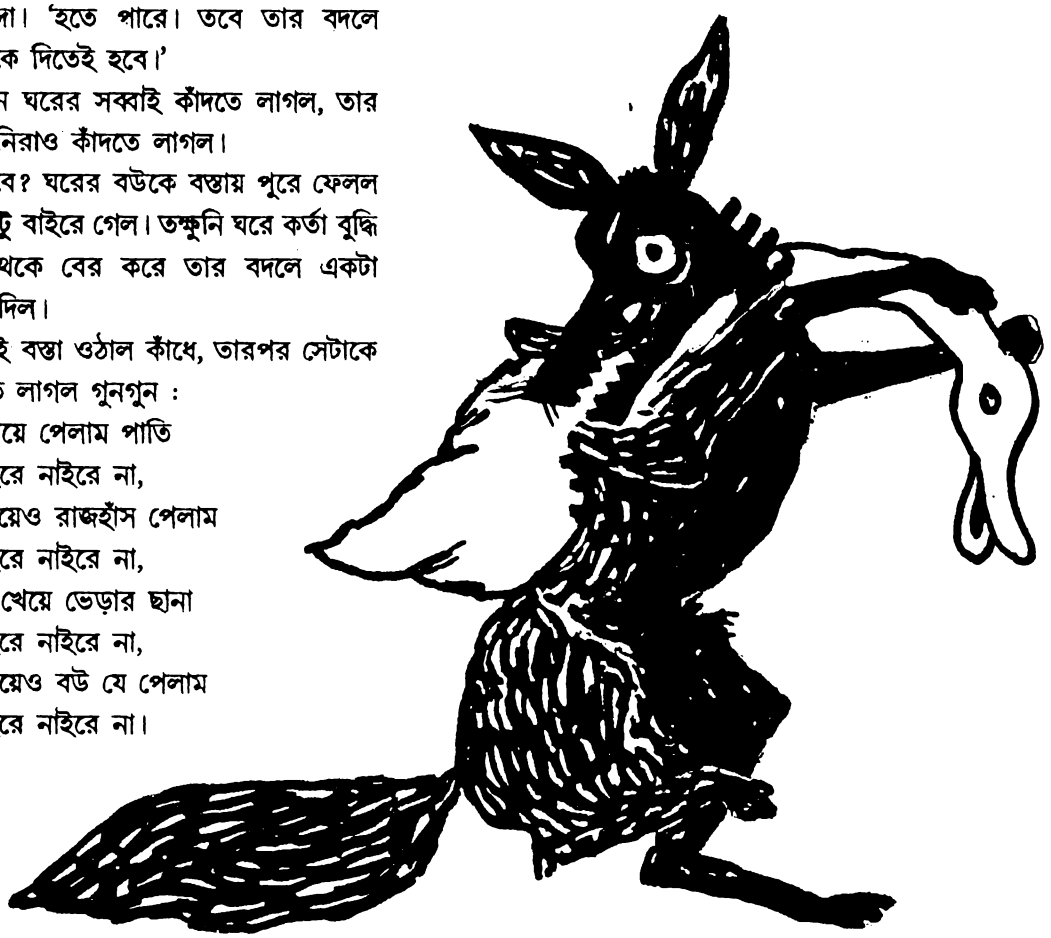

ছোট্ট কানদুটি বললে, 'আমরা ভয় পাচ্ছিলুম। যদি দুষ্টু কুকুর তোমাকে একবার ধরে ফেলে, তবে যে তোমার সোনালি কোট ও ছিঁড়ে ফেলবে। তাই....'

শেয়ালিদিদি এ কথা শুনে খুব খুশি হল, বললে, 'ধন্য আমার কানেরা। সোনার মাকড়ি গড়িয়ে দেব তোমাদের।'

শেয়ালি ওর ছোট্ট দুটি চোখকে এবারে বললে, 'ছোট দুটি চোখ আমার! তোমার বলো দৌড়বার জন্য কেন এত ব্যাকুল হয়েছিলে?'

চোখদুটি বললে, 'আমরা ভয় পাচ্ছিলুম, যদি দুষ্টু কুকুর তোমাকে ধরে ফেলে, তবে তোমার অতো সুন্দর কোটখানাকেও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে তাই....'

'ধন্যি আমার, চোখেরা। এর জন্য তোমরা পাবে সোনার চশমা।'

শেয়ালি এবারে ছোট্ট পাদুটিকে বললে, 'ছোট্ট দুটি পা আমার! তোমরা বলো দুষ্টু কুকুরের ভয়ে কেন এত দৌড়াচ্ছিলে?'

'শেয়ালিদিদি আমরা চাইছিলুম যাতে দুষ্টু কুকুর তোমাকে না ধরতে পারে। আর তোমার অমন সুন্দর সোনালি কোট না ছিঁড়তে পারে।'

'ধণ্যি আমার পায়েরা। তোমরা পাবে রুপোর হিলতোলা এক জোড়া লালজুতো।'

শেয়ালিদিদি এবারে বললে, 'ছোট্ট বন্ধু লেজ আমার। তুমি এবারে বলো আমার জন্য পড়িমড়ি করে কেন এত দৌড়াচ্ছিলে?'

লেজ বললে, 'আমিও চাইছিলুম খুব দৌড়তে। কিন্তু আমার ঝালর নিয়ে দৌড়তে পারছিলুম না। ভাবছিলুম ঝোপেঝাড়ে আটকে যাওয়ার চেয়ে দুষ্টু কুকুরের কাছে ধরা পড়াই ভালো।'

শেয়ালিদিদি বড্ড ক্ষেপে গেল। গর্তের বাইরে তার লেজ মেলে ধল। বললে, 'এই নে কুকুর আমার লেজ, ওকে কামড়ে শেষ কর।'

কুকুর এমন কামড়ালে যে গোটা লেজটাই খসে পড়ল।

রাগ কমতেই শেয়ালিদিদি খরগোশদের পাড়ায় ঘুরতে এল। শেয়ালিদিদির লেজ নেই দেখে ওরা হাসাহাসি করতে লাগল।

শেয়ালি তখন বললে, 'আমাকে লেজ না থাকতে পারে তবুও ঘুরে ঘুরে তোমাদের চেয়ে ভালো নাচতে পারি।'

'সেটা কেমন, শেয়ালিদিদি?'

'খুবই সোজা। তোমাদের সকলের লেজের সঙ্গে লেজ বাঁধিতে হবে, ব্যাস্।'

'বেশ তো তাই করো।'

সেইমতো শেয়ালিদিদি খরগোশদের তাদেরই লেজ দিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর নিজে একটা টিবির উপরে উঠে খুব উঁচু স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'খরগোশ বন্ধুরা পালাও, পালাও। বুড়ো নেকড়ে ওই আসছে।'

খরগোশেরা দৌড়তে চেষ্টা করল।

টানাটানি করল, পড়িমরি করে দৌড়তে গিয়ে সকলেরই লেজ গেল খসে।

শেয়ালিদিদি সুযোগ বুঝে কখন যে সরে পড়ল, কেউ জানল না। তারপর আবার তারা এক হল।

এ ওর দিকে তাকিয়ে দেখল, কারোরই লেজ নেই।

এবারে ঠিক করল, শেয়ালিদিদিকে একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। শেয়ালিদিদি কানে সব খবরই পৌঁছল।

'ব্যাপারটা মনে হয় খুব সুবিধের নয়। এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো' নিজের মনেই বললে শেয়ালিদিদি।

ব্যাস্ শেয়ালিদিদিকে আর পায় কে?

সেই জঙ্গল থেকে সেই যে পালাল, এখন পর্যন্ত তার কোনও খবরই নেই।

(ইউক্রেনের উপকথা)

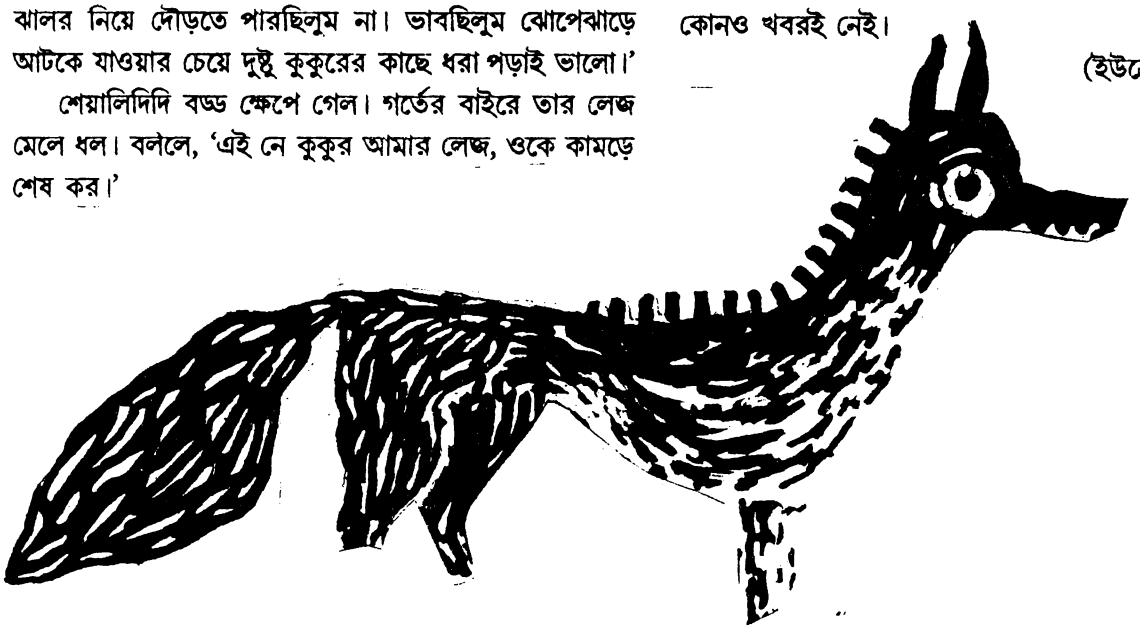

অশ্বত্থামার পা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটি স্টেশন ভেলাকোবা। নেহাৎই ছোট নাম, মনে রাখবার মত কিছুই নয়। কিন্তু একবার বছর কুড়ি-বাইশ আগে কয়েকদিন ধরে এই ভেলাকোবার নাম খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল। শুধু ছাপা হওয়া নয়, সমস্ত দেশের উদগ্র কৌতুহল যেন জমাট বেঁধে নেমে এসেছিল এই ছোট্ট জায়গাটিতে। কারণটাও হয়তো কারো মনে আছে। ওই স্টেশনেরই কাছাকাছি পাওয়া অদ্ভুত এক পায়ের ছাপ। অবিকল মানুষের পায়ের ছাপ, কিন্তু এক একটি পা প্রায় বাইশ ইঞ্চি লম্বা। সাধারণ মানুষের এক একটি পা সাধারণতঃ দশ-বারো ইঞ্চি হয়, কাজেই এই বিরাট পায়ের মালিক যে কত বড় অতিকায় মানব তা কল্পনা করাও কষ্টকর। ওটি আদপেই মানুষের পা কিনা তা নিয়েও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের কিন্তু সন্দেহ ছিল না ও পায়ের মালিক কে। কে আবার? অশ্বত্থামা! ত্রেতা যুগের হনুমান আর দ্বাপর যুগের অশ্বত্থামা-এঁরা যে কর্মগুণে অমর হবার বর পেয়েছিলেন এ কথা কে না জানে? সেই অশ্বত্থামারই পাদস্পর্শে ভেলাকোবার মাটি পবিত্র হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দেখা কেউ পায়নি। ওই রহস্যময় বিরাট পায়ের চিহ্নটুকু রেখে আবার তিনি অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

বাইশ বছর আগেকার ঘটনার কথাটা লোকে প্রায় ভুলেই বসেছিল। আমারও তো উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু দুনিয়ার কত ব্যাপারেরই তো পুনরাবর্তন ঘটে। অশ্বত্থামাও যে আবার ফিরে আসবেন তাতে আর বিচিত্র কি? তবে বারে বারে তাঁকে একই জায়গায় দেখবার আশা করা অন্যায়। ভেলাকোবার নয়, তাই এক নতুন জায়গায় তাঁর দেখা মিলল।

ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি, এবং একটু আগের থেকেই জের টেনে নিয়ে আসা যাক। দেরাদুনের ফরেস্ট বা বন-বিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর হাতে-কলমে কাজ শিখে সুধেন্দু চাকরি নিয়ে চলে এল আসামের জঙ্গলে। শুধু যে চাকরির খাতিরে এল তাই নয়। আসামের অরণ্যসম্পদ্ সম্বন্ধে তার বরাবরই কেমন একটা মোহ ছিল। তার টানও বড় কম নয়। এসে দেখল ভুল করে নি সে। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য যেন উজাড় করে দিয়েছেন এখানে। চারদিকে পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা জায়গাটি। এখানে ওখানে ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, পাহাড়ী ঝর্ণা এঁকেবেঁকে নুড়ির বুকে কলধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে। মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড এক ঝিল—ছোটখাট হ্রদ বললেও ভুল হয় না। হাজার রকমের নাম-না-জানা পাখিরা ভিড় করে আসে সেখানে সন্ধ্যার দিকে। তাদের কলস্বরে মুখরিত হয়ে ওঠে বনানী। শুধু কি পাখি? কত রকম বুনো জানোয়ার আসে জলের লোভে। দল বেঁধে আসে বুনো হাতির পাল—পায়ের ভারে মাটি কাঁপে। আসে লম্বা শিংওয়ালা হরিণের দল—মখমলের মত গায়ের চামড়া, তাতে শ্বেত চন্দনের ফুটকি। কখনও আসে ডোরা-কাটা বাঘ,—হিংসার মূর্ত প্রতীক, কিন্তু কি সুঠাম দেহ! আসে আরো কত ছোট-বড় জানা-অজানা জানোয়ার। এত অল্প

জায়গায় এতরকম প্রাণীর সমারোহ পৃথিবীর অল্প জায়গায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু জানোয়ারের ওপর সুধেন্দুর মোহ ততটা নেই যতটা আছে বৃক্ষসম্পদের ওপর। বিরাট বিরাট বনস্পতি যুগ যুগান্তরের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুরিনামা বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শাল, সেগুন, তমাল, মায় মেহগিনী—কী নেই সেখানে? কাঁটা ঝোপ থেকে শুরু করে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য গাছের ভিড়। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সুধেন্দু তাদের অনেকগুলির নামই জানে না, ধরন-ধারন তো দুরের কথা। এ যেন একটা বিরাট বোটানিকাল গার্ডেন। কিন্তু মানুষের হাতে গড়া নয়—প্রকৃতির হাতে গড়া।

মোটা মাইনের চাকরি; সরকারি বনবিভাগের এক রকম কর্তা বললেই চলে। অধীনস্থ কর্মচারীরা বলে 'সাহেব'। আগে আগে সাদা চামড়ার সাহেবরাই ছিল এই পদে, এখন একটি দু'টি করে ভারতীয় এসে তাদের জায়গা দখল করছে। সুধেন্দু যাঁর জায়গায় এল তিনিও সাহেব,—মিঃ টমাস্। বয়স্ক লোক, বেশ অমায়িক। প্রথম দিনটা তাঁরই ওখানে আতিথ্য নিয়েছিল সুধেন্দু, মিসেস টমাস্ মায়ের মতই এটা-ওটা যত্ন করে খাইয়েছিলেন। টমাস্ সাহেবও গল্প করেছিলেন অরণ্যজীবনের নানা অভিজ্ঞতার। সামাজিক লোক,-যাদের বলা হয় সোসাইটি-ম্যান্, তাদের জন্য এ জায়গা নয়। বনকে যারা ভালবাসতে পারে তাদের জন্যই এ অঞ্চল। কথা বলবার লোকেরও খুবই অভাব এখানে। ভদ্র অর্থাৎ শিক্ষিত বলতে দু'-চারজন সহকারী ছাড়া বেশি কেউ নেই। তবে মজুরের দল আছে। কতক বাইরে থেকে আসা, কতক এখানকার স্থানীয় পাহাড়ী জাত,—এই বনের সঙ্গে অদ্ভুত মানানসই তারা। চাল-চলনে বন্য প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সরল জীবনের একটা আশ্চর্য রকম সমন্বয়। টমাস্ বললেন, 'এদেরই মধ্যে আপনার দিন কাটাতে হবে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু মানিয়ে নিতে পারলে হয়তো ভালোই লাগবে এ জীবন।'

তা সত্যই বলেছিলেন টমাস্। কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রথম প্রথম বিব্রত হয়েছিল সুধেন্দু, কিন্তু কিছুদিন পরেই এ জীবন সয়ে এল তার। একা মানুষ, আপিসের কাজ খুব একটা বেশি নয়; অবসর তার চেয়ে প্রচুর। সেই অবসর কাটাবারও প্রচুর খোরাক রয়েছে এখানে। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। কত কি দেখবার, কত কি জানবার রয়েছে প্রকৃতির এই অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে।

বেশ কাটছিল দিনগুলি, এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ছেদ পড়ল। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ দেখা গেল সেই জঙ্গলে এক পায়ের ছাপ। সেই বাইশ ইঞ্চি লম্বা অশ্বত্থামার পা। প্রথম চোখে পড়ে ঝমরু কুলীর বৌ বাসমতিয়ার। ঝরণার ধারে জল আনতে গিয়েছিল সে খটখটে বেলায়। হঠাৎ দেখে একটা বিরাট গাছ কে উপড়ে ফেলে দিয়েছে, আর তার পাশেই টাটকা মানুষের পায়ের ছাপ। দেখতে হুবহু মানুষেরই মত কিন্তু আকারে মানুষের পায়ের দ্বিগুণ হবে। তাই দেখে বাসমতিয়ার আর জল নেওয়া হয়নি। মাটির কলসী ঝরণার পাশেই ফেলে রেখে সে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসেছে স্বামীকে খবর দিতে। শুনে ঝমরু ২/৩ জন সঙ্গী নিয়ে তলায় সড়কি বসানো বাঁশের লাঠিটা বগলে করে দেখে এসেছে সেই অভাবনীয় দৃশ্য। অশ্বত্থামা কি আবার এলেন? কিন্তু এ তো ভেলাকোবা নয়, এ যে আসামের দুরন্ত জঙ্গল। এখানে, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে তাঁর কি প্রয়োজন থাকতে পারে আসবার? নাকি এ অশ্বত্থামা-টামা নয়, কোনও অজানা অশরীরীর পদচিহ্ন? কিন্তু অশরীরীর তো পায়ের চিহ্ন হতে পারে না! তবে? দু'-তিন দিন বেশ একটা উত্তেজনায় কাটল। তারপর ভয়টা যখন একটু স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখন খবর পাওয়া গেল আবার দেখা গেছে সেই রহস্যময় পায়ের ছাপ। এও একটা ঝরণার ধারে, তবে আগের ঘটনার স্থল থেকে মাইলখানেক দুরে। ওখানেও ঐ রকম বিরাট গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে—একটি নয়, দু'টি নয়,—পর পর তিনটি। গাছ শুধু ফেলাই হয়নি, তাদের শেকড়গুলোও কে যেন খুবলে খুবলে নিয়েছে। তার পাশের মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে করা হয়েছে ক্ষতবিক্ষত।

সুধেন্দু ব্যাপারটাকে আর সহজে উড়িয়ে দিতে পারল না। আরও একটা কারণ ছিল। যে গাছগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়েছে সেগুলো বিশেষ এক জাতের দুষ্প্রাপ্য গাছ। মুল্য শুধু ওর কাঠের জন্য নয়, এ গাছের পাতার এবং কুঁড়ির এমন কয়েকটা রাসায়নিক গুণ আছে যাঁর জন্য ভেষজ বৃক্ষ হিসাবেও এর দাম বড় কম নয়! ভেষজ বৃক্ষ মানে হচ্ছে যে গাছ থেকে ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই, যে ভাবে গাছগুলিকে উপড়ে ফেলা হয়েছে তাতে মনে হয় না যে ওর ওই সব গুণের জন্য কেউ ওঁর ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। গাছের একটি পাতাও কেউ ছেঁড়েনি, একটি কুঁড়িতেও কেউ হাত দেয়নি। গাছের গুঁড়ির দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় কোনও ধারাল অস্ত্রও প্রয়োগ করা হয়নি গাছ কেটে ফেলতে। কাঠের লোভে গাছ ফেলা হয়ে থাকলে

কখনও ওভাবে ওপড়ানো হ'ত না। তাছাড়া আশপাশে শাল, সেগুন প্রভৃতি আরও বহু গাছ অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে—যেগুলি কাষ্ঠসম্পদের দিক্ দিয়ে আরও মুল্যবান্।

'স্যর, এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার। নইলে রাতারাতি, নিঃশব্দে এ কাজ কি কোন পৃথিবীর মানুষের পক্ষে করা সম্ভব?' বড়বাবু বললেন। তারপর রাম বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বল রাম বাহাদুর?'

রাম বাহাদুর জাতে নেপালী। ওর পূর্বপুরুষেরা নাকি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু করেনি। লড়াইয়ের কথা শুনলে ওরও রক্ত নাকি টগবগ করে ওঠে। কিন্তু এ যে ভৌতিক ব্যাপার। এখানে তার কিছুই করবার নেই। সে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল 'জী হুজুর।'

'আমার কিন্তু মনে হয় স্যর, ও ভূতটুত কিছু নয়,—এ নিশ্চয় কোন অতিকায় মানবাকৃতি বানরজাতীয় জীবের কাজ। সেই যে সেবার কলকাতায় 'কিং কং' ছবি দেখেছিলাম—সেই রকম কোনও জীব। পায়ের ছাপটা দেখেছেন একবার?' বললে একজন ছোকরা সহকারী শিবতোষ।

কথাটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বাইশ ইঞ্চি লম্বা পায়ের ছাপ যার সে যে আকারে কিং কং এর মতই কেউ হবে এতে আর আশ্চর্য কি? অশরীরী প্রাণীর পক্ষে পায়ের ছাপ থাকা একটু সন্দেহজনক। তবে ওদের সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সবই তো ধোঁয়া ধোঁয়া। কিছুই বলা যায় না। তা যাই হোক জীবটি যে অসম্ভব শক্তির অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওই সব বড় বড় গাছ কুড়ুল ছাড়া শুধু মুচড়ে, হ্যাঁ, রকম দেখে মনে হয় মুচড়েই গোড়াশুদ্ধ উপড়ে আনা চারটিখানি কথা নয়! হ্যাঁ, শিকড়গুলো যে ভাবে নখ দিয়ে খুবলে ছেঁড়া হয়েছে তাতে কোন ভয়ংকর প্রাণীর কথাই মনে হবে হয়তো। শুধু শিকড় খুবলানো হয়নি, তার পাশের মাটিও খুবলে নেওয়া হয়েছে।

সুধেন্দু হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। শিবতোষের কথাটা নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয়। যদি সত্যিই তাই হয়,—কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরই আর্বিভাব হয়ে থাকে এখানে,—তা হলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বড় কম নয়। হয়তো রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে এই জায়গা, সেই সঙ্গে এখানকার বাসিন্দারাও। কিন্তু আগে দেখতে হবে নিজেদের

নিরাপত্তা। বয়সের দিক দিয়ে না হলেও পদমর্যাদায় সে-ই এখানকার কর্তা। কাজের দায়িত্বটা তারই বেশি। সবাইকে সাবধান থাকার উপদেশ দিয়ে চিন্তিত মনে বাংলোয় ফিরে এল সুধেন্দু।

কয়েকদিন চুপচাপ কাটল। চারদিনের দিন আবার শোনা গেল সেই কাহিনী। আর ঠিক সেইদিনই এসে হাজির হল সুধেন্দুর অন্তরঙ্গ বন্ধু কৌশিক।

কৌশিক সুধেন্দুর সহপাঠী। এম. এস্-সি পাশ করে এখন রিসার্চ্ করছে, অর্থাৎ কৌশিক বিজ্ঞানী। কিন্তু বিজ্ঞানী বললে ওর ঠিক পরিচয় দেওয়া হবে না। কৌশিক বিজ্ঞানী, কৌশিক কবি, কৌশিক রসিক, কৌশিক ডানপিটে। ও যেন সব কিছুরই একটা মূর্তিমান্ ব্যতিক্রম।

এখানে আসবার পর থেকেই সুধেন্দু তাকে একবার আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিল। 'সময় নেই'এই অজুহাতে এতদিন কাটিয়েছে কৌশিক। আজ, হঠাৎ আচমকা, বলা নেই, কওয়া নেই, মূর্তিমান্ বিস্ময়ের মত সে যে এই জঙ্গুলে রাজ্যে এসে হাজির হবে সুধেন্দু তা ভাবতেও পারেনি।

'ইচ্ছে হ'ল, চলে এলাম।' ব্যস, এক কথায় কারণ জানাল কৌশিক।

কিন্তু যত সহজে এসেছিল তত সহজে ফেরা হ'ল না তার। কারণটা আর কিছু না—সেই অশ্বত্থামার পা। এত বড় একটা রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চল ছেড়ে যাবে সে রকম ছেলে নয় কৌশিক। ফলে বেড়াতে এলেও এখন থেকে বেশির ভাগ সময়ই তার কাটতে লাগল ওই রহস্যজনক ঘটনাস্থলের আশেপাশে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পায়ের ছাপ থেকে শুরু করে আশপাশের যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করে যেতে লাগল সে। শুধু গিয়ে পরীক্ষা করা নয়,—ইটপাটকেল, পাথরের টুকরো, মাটি, কাদা-জল—কত কী যে ওখানে থেকে কুড়িয়ে এনে সে সুধেন্দুর ঘর ভরিয়ে তুলল তার ঠিক নেই। সুধেন্দু ঠাট্টা করে বলল, 'সবই তো করলি এ জীবনে। গোয়েন্দাগিরিটা বাকি ছিল, এবার সেটাও হয়ে যাবে বোধ হচ্ছে।'

কৌশিক গম্ভীরভাবে শুধু বলল, 'হুঁ।'

দু'-তিন দিন এইভাবে কাটবার পর হঠাৎ একদিন কৌশিক গিয়ে ঢুকল স্থানীয় লাইব্রেরীতে। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় লাইব্রেরী! শুনতে আশ্চর্য লাগে বৈকি! কিন্তু এও টমাস্ সাহেবের কীর্তি। সময় কাটাবার জন্য বইয়ের মত সঙ্গী নেই—মনের খোরাক মেটাবার জন্যও নেই ওর মত সাথী। টমাস্ সাহেব এটা বুঝেছিলেন এবং ওপরওয়ালাদের লিখে এখানে একটি ছোটখাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। তবে সাধারণ নাটক-নভেলের লাইব্রেরী নয়, তাঁর সংগৃহীত বেশির ভাগ বই-ই ছিল গাছপালা—উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। নানারকম বনজ সম্পদ্, বনজ খনিজ ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু ভালো ভালো বই ছিল। মোট কথা, জঙ্গল নিয়ে যাদের কারবার তাদের উপযোগী বই-এর অভাব ছিল না ওখানে। কৌশিক দু'দিন ঘুরেই এটি আবিষ্কার করল, তারপর ঢুকল গিয়ে ওর মধ্যে। দু'বেলা খাওয়াদাওয়া আর রাত্রে ঘুমোবার সময়টা ছাড়া সারাক্ষণই সে লাইব্রেরীতে থাকত। সুধেন্দু বিরক্ত হ'ল, কিন্তু বন্ধুকে সে চিনত, তাই বাধা দিল না।

ইতিমধ্যে আরও বার দুই দেখা গেছে সেই রহস্যজনক পায়ের ছাপ। কখনও বনের এ প্রান্তে, কখনও ও প্রান্তে। সেই রকম ঝরণার ধারে ওই একই জাতের গাছ উপড়ে ফেলা। তেমনি ভাবে নখ দিয়ে শিকড় থুবলানো, পাশে অদ্ভুত সেই পায়ের ছাপ।

স্থানীয় লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সন্ধ্যার দিকে তো নয়ই, দিনের বেলাও কেউ দল না বেঁধে এবং লাঠিসোটায় সুরক্ষিত না হয়ে এদিক্ ওদিক্ চলাফেরা করে না। কুলীদের ব্যারাকে তো কথাই নেই। অশ্বত্থামার পুজো দিয়ে তাঁকে শান্ত করার প্রস্তাব উঠেছে সেখানে। কিছু কিছু চাঁদাও উঠে গেছে এরই মধ্যে।

'আচ্ছা সুধা, তোদের এখানে তো বেশ ভালো মাইক্রোস্কোপ আছে, নিকল্ প্রিজম্ দেওয়া জিওলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ আছে কি?' হঠাৎ প্রশ্ন করে কৌশিক।

'আছে বোধ হয়। কেন বল তো? এবারে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে ফের রিসার্চ্ করবি বুঝি?'

'ঠাট্টা নয়। এই দেখ্ আজ কি পেলাম সেই ঝরণার ধারে।' ব'লে কৌশিক পকেট থেকে একটা চক্‌চকে চৌকো কালো পাথর বার করল। পাথরটার গায়ে তামাটে আঁচড় কাটা। দু'-একটা আঁচড় বেশ জ্বল্ জ্বল্ করছে।

সুধেন্দু কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

'রহস্যের দশ আনা বার করেছি। বাকিটা—আচ্ছা, তুই না বলেছিলি কয়েকজন মধুয়াল, সরকার থেকে পারমিট নিয়ে এই জঙ্গলে এসেছে মধু সংগ্রহের জন্য? আলাপ করেছিস তাদের সঙ্গে? কোথায় থাকে ওরা? চল্ একদিন আলাপ করে আসি।'

'ওঃ! এই তোর রহস্য উদ্ধার? আমি ভাবি, না জানি

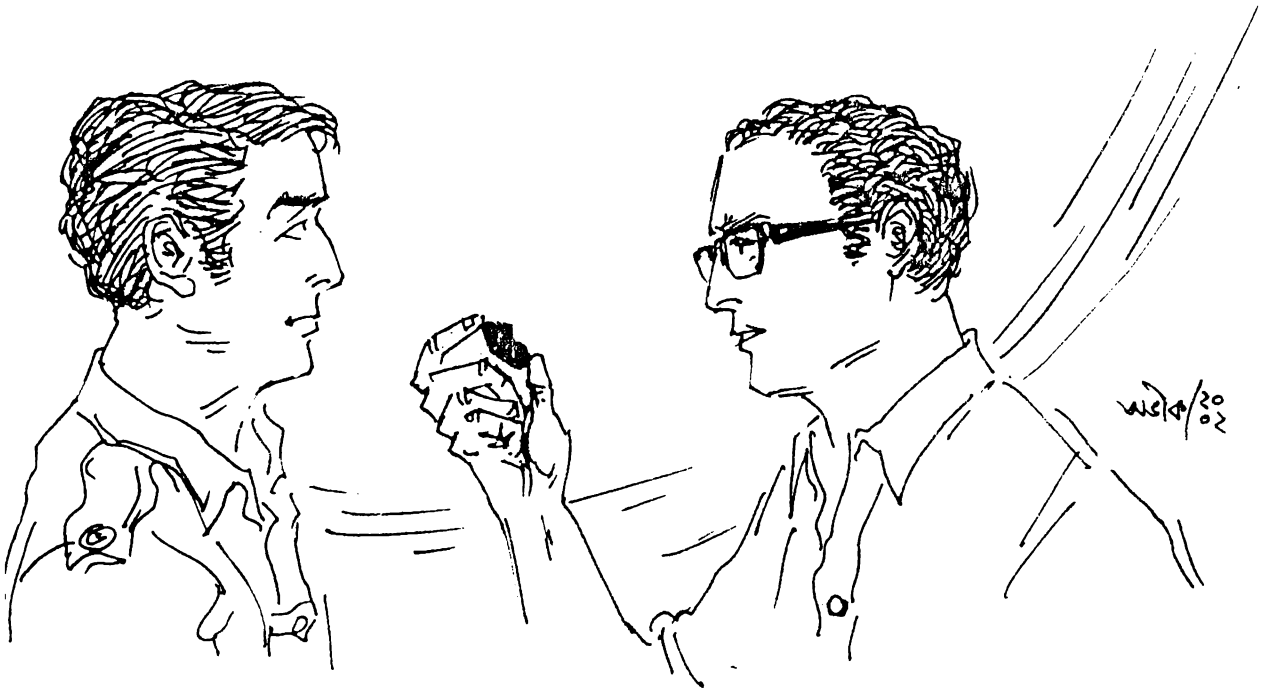

কি! হ্যাঁ, এসেছে বটে। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। পিয়ালকুচির বাঁকে একটা তাঁবুতে আছে ওরা। দু'তিন জনের বেশি নয়। প্রতি বছরই আসে। একেবারে নিরীহ গোবেচারী লোক। কোন্ গাছে মৌমাছি চাক বাঁধল ঘুরে ঘুরে দেখে, আর দেখতে পেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে মধু সংগ্রহ করে তারপর একটা ফী নিয়ে মধু নেবার পারমিট দেওয়া হয়। অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না, তবে ও-প্রথা এখানে বহুদিন চলছে।'

'চল্, তা হলে আজই আলাপ করে আসি। আমরাও বিদেশী, বিদেশী বিদেশীতে আলাপ ভালোই জমবে।'

সারাদিন কৌশিক যন্ত্রপাতি নিয়ে সমানে বসে কাজ করল। দুপুরের পরে চলল মধুয়ালদের ডেরায়। সেখানে গিয়ে দেখল কেউ নেই তাঁবুতে। কাজে বেরিয়েছে। একটা কাঁটাতারের আলগা বেড়া দিয়ে তাঁবুতে ঢুকবার মুখটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কৌশিক সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আশেপাশে কি খুঁজতে লাগল।

তাঁবুর পাশেই কতকগুলো বড় বড় জালার মত পাত্র পড়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় এগুলো মধু রাখার পাত্র। কিন্তু বোধহয় ভাঙা বা পরিত্যক্ত, কেননা মধুর কোনও গন্ধ নেই ওতে। কৌশিক সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে উল্টে দিল একটা জালা। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম আর ফর্ক্ —কাঁটা চামচের মত কাঁটাওয়ালা অস্ত্র যা দিয়ে মাটি খুবলে খুবলে আলগা করে নেওয়া যায়। আর পাওয়া গেল কয়েক জোড়া গাম বুট্—ঠিক যেন এক-একটা বিরাট মানুষের পা—পাঁচটা আঙুল সমেত।

কৌশিক এবার আর কোন দ্বিধা না করে কাঁটাতারের বেড়া তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়ল। সুধেন্দুকে ইশারায় ডেকে বলল, 'আয়।'

একটু ইতস্ততঃ করে সুধেন্দু বলল, 'ট্রেসপাস্?'

'হুঁ। ভীরু কোথাকার! চলে আয়।' আদেশের স্বরে বলল কৌশিক।

তাঁবুর ভিতরে যা দেখা গেল তাতে আর বিস্ময়ের সীমা রইল না সুধেন্দুর। বড় বড় বোতল ভর্তি নানারকম অ্যাসিড, আরক আর রাসায়নিক মশলা। এক কোণে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ভাঙা পাথরের চাঁই। দেখলেই বোঝা যায় মাটির অনেক তলা থেকে টেনে বার করা হয়েছে সেগুলোকে। পাথরের গায়ে আঁকাবাঁকা সুতোর মত কতকগুলো দাগও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

কৌশিক এটা দেখল, সেটা দেখল, অনেক শুঁকল, তারপর উচ্চারণ করল, 'হুঁ', অর্থাৎ কাজ হাসিল।

'এখনই কোয়ার্টারস্এ গিয়ে কয়কজন আর্ম্ড গার্ড্কে

পাঠিয়ে দে; জায়গাটা পাহারা দিতে হবে। আমি অপেক্ষা করছি, এর মধ্যে যদি মধুয়ালরা আসে, আলাপ জমিয়ে নিতে পারব।'

মধুয়ালরা আসবার আগেই সরকারী প্রহরীর দল জায়গাটা ঘেরাও করে ফেলেছিল। তারা প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পারল তখন আর পালাবার উপায় ছিল না। তারপর তাদের নামে মামলা রুজু করা হ'ল। সে অনেক ব্যাপার।

সুধেন্দুর ঘরে সন্ধ্যার দিকে একটি আসর বসেছে। সেখানে সুধেন্দুর অধীনস্থ আরও কয়েকজন বন-বিভাগের কর্মী এসে জুটেছে। খাওয়াদাওয়ারও আয়োজন হয়েছে। বক্তা কৌশিক। সে বলতে লাগল ঃ

'প্রথমতঃ, এত রকম গাছ থাকতে বিশেষ একটা গাছের উপরেই হয়েছে যত সব হামলা, অথচ গাছগুলোকে কেউ কাটেনি, শুধু গোটা গাছটা উপড়ে ফেলেছে শিকড় সমেত, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে হামলাদারদের আক্রমণ অন্য কিছুর ওপর, গাছের ওপর নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটা গাছ একটা না একটা ঝরণার পাশ ঘেঁষে উঠেছে।

'পায়ের ছাপগুলি সত্যি রহস্যময়। অত বড় ছাপ মানুষের হয় না, যদি কারও হয় তো সে এক অতিকায় জীব, যার সম্বন্ধে সাধারণতঃই ভয় হয়। যাতে ওর কাছে কেউ না যায় সেই জন্যই এই ছাপ ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি, ছাপের সামনের দিকে ভর দিয়ে আমরা কখনও হাঁটি? না, পা টিপে টিপে চলার সময়ে শুধু এ রকম করা হয়। অর্থাৎ ছাপগুলোকে যে ওভাবে ফেলা হয়েছে ও একেবারে ইচ্ছাকৃত। কোন জংলী অতিকায় জীবের কি ওরকম ভাবে চলার কোন কারণ থাকতে পারে? ওই দেখে আমার মনে হ'ল ওটা কোন দুষ্টু লোকের কারসাজি। যতটা সম্ভব গোপনে কাজ হাসিল করবার উদ্দেশ্যে ওই রকম করা হয়েছিল, যদিও বনের মধ্যে ওর ততটা দরকার ছিল না। এরপরেই ওখানে একটা পরিত্যক্ত কষ্টিপাথর কুড়িয়ে পেয়ে মস্ত সূত্র পেয়ে গেলাম। এখানে ও-রকম সুন্দর চৌকা মাপের একটা পাথর কোত্থেকে এল? এখানে তো ও-জিনিস হয় না! নিশ্চয় কেউ ফেলে গেছে।

'আপনারা সবাই জানেন, সোনা খাঁটি কিনা কষ্টিপাথরে ঘষে দেখেই বুঝতে পারা যায়। তাই, হঠাৎ আচমকা এ জায়গায় একটা কষ্টিপাথর দেখে চন্ করে মাথায় একটা অদ্ভুত ধারণা বা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল, আর ব্যাপারটা খোলসা করে নেবার জন্য তখুনি ছুটলাম লাইব্রেরীতে। বেঁচে থাকুন মিস্টার টমাস্।'

চায়ের পেয়ালায় পর পর কয়েকটা দীর্ঘ চুমুক ছিল কৌশিক। তারপর ফের শুরু করল।

'এখানকার লাইব্রেরীতে গল্পের বই থাকুক উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান অর্থাৎ বোটানি, ভূ-বিজ্ঞান অর্থাৎ মিনারেলজী প্রভৃতি বিষয়ের অনেক আধুনিক বই আছে এ আমি আগেই দেখে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে জিও-বোটানি। জিওলজী আর বোটানি মিশিয়ে এই শাস্ত্রটি তৈরি হয়েছে। এইবার সেই-গুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম আমি। যারা এই শাস্ত্র বা বিজ্ঞান নিয়ে একটু-আধটু চর্চা করেছে তারা অনেকেই জানে যে কোন কোন জাতের গাছ আছে যারা তাদের দেহের বৃদ্ধি জন্য সাধারণ ধাতব পদার্থ ছাড়া কোন কোন মূল্যবান্ ধাতুও মাটি থেকে টেনে নেয়—ক্রোমিয়াম্, মলিবডিনাম্, ভ্যানাডিয়াম্, প্রভৃতি ধাতু। আবার এক রকম গাছ আছে যাদের নজর সোনার ওপর। সাধারণ ধাতুতে তাদের যেন মন ওঠে না! অবশ্য যে সোনা তারা টেনে নেয় তার পরিমাণ খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু কোন কোন জাতের গাছ আছে যারা অল্প সোনায় খুশি নয়—মাটির রসের সঙ্গে বেশ খানিকটা সোনা তারা টেনে নিতে পারে। লাইব্রেরীতে বসে বসে বই ঘেঁটে এই ধরনের কয়েকটা গাছের নাম আর হালচাল বার করলাম। দেখলাম, যে গাছগুলো ওপড়ানো হয়েছে সেগুলো ওই জাতেরই গাছ।

'গাছ সোনা টেনে নিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মাটিতে তো সোনা ফলে না! নিশ্চই এই সব গাছ এমন জায়গায় জন্মায় যার কাছাকাছি মাটির নীচে পাথরের গায়ে সোনার আকর আছে—তা যতটুকু সোনারই হোক না কেন। সোনা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, অনেক সময়ই অন্যান্য ধাতুর মত অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলে-মিশে,—অথাৎ বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন যৌগিক পদার্থ, সেইভাবে,—থাকে না। একেবারে খাঁটি মৌলিক পদার্থ রূপেই পাওয়া যায় ওকে। দল-ছাড়া এই অবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'নেটিভ ডিপোজিট্'। আবার, এও দেখা গেছে, —পাহাড়ী নদী, ঝরণা ইত্যাদির নীচেই এই রকম সোনা বেশি পাওয়া যায়। কখনও সূক্ষ্ম রেণুর আকারে, কখনও বা পাথরের ফাটলে সোনার সুতোর আকারে। খুব দূর থেকে রস টেনে নেওয়া গাছের পক্ষে অসুবিধাজনক, তাই খাদ্যভাণ্ডারের যত কাছাকাছি থাকা যায় সেই চেষ্টা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এই গাছগুলো যখন রয়েছে তখন তাদের কাছাকাছি সোনা থাকার সম্ভাবনাও খুব বেশি।

'ব্যাপারটা তা হলে খতিয়ে দেখা যাক। এখানকার

সরকারী সংরক্ষিত বনে রয়েছে ওই সব 'সোনাখেকো' গাছ। কাজেই তাদের কাছাকাছি সোনাও রয়েছে নিশ্চই। কিন্তু এ হচ্ছে সরকারী সম্পত্তি—সাধারণের পক্ষে তা উদ্ধার করা বে-আইনি। কাজেই ওই সব সোনা নিয়ে রাতারাতি বড়লোকে হ'তে হ'লে একটু আধটু কারসাজি করতে হবে বৈকি! এখানেও তাই করা হয়েছে।

'যারা মধুয়াল সেজে এসেছে তারাই হচ্ছে এই স্বর্ণসন্ধানী। ওরা ছাড়া কোন বাইরের লোক এ-অঞ্চলে নেই। স্থানীয় লোকদের চালচলন কারও অজ্ঞাত নয়, কাজেই সন্দেহটা ওদের ওপরেই পড়া স্বাভাবিক। সত্যি কিন্তু ওরা মধুয়াল নয়, মধুসংগ্রহটা লোক-দেখানো মাত্র; আসল উদ্দেশ্য বে-আইনী ভাবে সোনা সংগ্রহ। মধুর পারমিট পাওয়া এ অঞ্চলে বেশি কঠিন নয়। মধুয়াল সাজলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এদের অনেক বেশি এবং, আমি জানি না, হয়তো মামলার সময় জানা যাবে, এদের পেছনে সম্ভবতঃ কোন উচ্চশিক্ষিত বড় বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর দলও রয়েছে। যাই হোক্, যা বলছিলাম।'

'লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে, তাই ওই অমানুষিক পায়ের ছাপ তৈরি করা হয়েছিল। পদশব্দ বন্ধ করবার জন্য এই ভারী বুট, হোক না তা রবারের, প'রেও ওই ভাবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছিল, সেটা আমি আগেই ধরে ফেলেছিলাম। কিন্তু ও আর কতটুকু শব্দ? আসল শব্দ হবে গাছ কাটতে গেলে। এর উপায় বার করতেও কষ্ট হয়নি ওদের। তাঁবুতে বোতলের মধ্যে এমন কতকগুলো ওষুধ পেয়েছি যা গাছের গোড়ায় দিলে কয়েক দিনের মধ্যে গোড়া শুকিয়ে আলগা হয়ে। পরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে আর কতক্ষণ? তা ছাড়া ওসব গাছের শিকড়গুলো খুব লম্বা হয়, আর তারাই তো সোনার সন্ধান দেয়। শিকড়গুলো ছাড়াবার জন্য ফর্ক্ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় কি? ওই ফর্ক্ও তাঁবুতে দেখলাম। গাছের গোড়ায় আঁচড় খোবলানো কেন তাও বুঝলাম। গাছ উপড়ে শিকড় খুঁড়ে অনেকদূর পর্যন্ত তলাকার মাটি তুলে নেওয়া হয়েছিল সোনা বার করার জন্য।

'যে মাটি বা পাথর পাওয়া গেছে তাতে সোনা আছে কিনা পরখ করবার জন্য কষ্টিপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরকে খুব পাতলা করে, স্বচ্ছ করে ঘষে নিয়ে জিওলজিক্যাল মাইক্রসকোপের নীচে ফেললে তার ভিতরকার উপাদান আরও সহজে ধরা পড়ে। বিশেষ করে সেটা কোন্ পাথর বা কোন্ মিনারেল তা চিনতে পারা যায় সহজেই। যে সব পাথরে সোনা থাকে তাও চিনতে পারা যায় এতে। আমি ওখানকার পাথর কুড়িয়ে এনে মাইক্রস্কোপে পরীক্ষা করে দেখেছি যে ধরনের পাথরে সোনা থাকা সম্ভব এ সেই জাতের পাথর। কাজেই আমার ধারণা প্রায় অভ্রান্ত। তার পর সুধেন্দুর 'কিন্তু-কিন্তু' ভাব উপেক্ষা করে ওদের ডেরায় হানা দিয়ে বাকি সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়েছে।'

'কিন্তু—' গুরুচরণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, শিবতোষ বাধা দিয়ে বলল, ''আর কিন্তু-কিন্তু নয়। স্যর এত খাবারের আয়োজন করেছেন, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক আগে।'

'কিন্তু কুলী ব্যারাকের পুজোটা?'

'পুজো হোক না যেমন হচ্ছে। প্রসাদ তো কিন্তু অবিশ্বাসীদের কাছেও পরম লোভনীয়!' হাসতে হাসতে বললে কৌশিক।

ছবি : অতীন্দ্রকুমার মৈত্র

ক্যাওড়াতলা বিধানসভায়

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

ক্যাওড়াতলা বিধানসভায়
শ্যাওড়াগাছের প্রতীকে,
নির্বাচনে লড়ার জন্যে
হয়েছেন আজ ব্রতী কে?

তাও জানো না? নাম হলো তাঁর
ব্রহ্মদত্যি চাটুজ্যে,
আগের জন্মে খুব ভুগেছেন
বাত ছিল তাঁর হাঁটুর যে!

'বাত' ছিল তাঁর হাঁটুতেই নয়
'বাত' ছিল তাঁর মুখেতেও,
লম্বা-চওড়া বাত ঝাড়তেন
সাহস ছিল বুকেতেও!

ছিলেন দারুণ ডাকাবুকো
এবং পটু ভাষণে,
সাত-সাতবার জিতেছিলেন
ঘুঘুডাঙার আসনে!

'বারবার ঘুঘু ধান খেয়ে যায়
পড়বে ধরা এখনই,'
'ঘুঘু দেখেছ কিন্তু ভায়া
ফাঁদ তো কেউই দ্যাখোনি!'

মিথ্যে প্রমাণ করেই তিনি
এসব প্রবাদ-প্রবচন,
সারাজীবন শুনিয়ে ছিলেন
ভাঁওতা -ভাষণ ও বচন!

এই জন্মেও ঝালিয়ে গলা
চালিয়ে ভাষণ বীর-বাচন,
গলার জোরে পাগল করে
যাবেন জিতেই নির্বাচন!

জিতলে তিনি ভূত জগতের,
হবেন 'প্রাইম-মিনিস্টার',
বলেছেন 'মান' দেবেন ছড়ার
মানে 'রাইম' জিনিসটার?

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

মোতিউরের বাঘের গপ্পো

বিমান ঘোষ রায়

ছোট মোল্লাখালি দ্বীপে বেড়াতে গেছি সেবার। গোসাবাতে এলে বড় মোল্লাখালি, ছোট মোল্লাখালি ঘুরে আসতে হয়। তা সে এক বেলার জন্য হলেও। যেতেই হয়, তা নয়তো মনসারাম ও বাঞ্ছারাম খুবই রাগ করে। দুই ভাই একই দ্বীপে থাকলে তবুও কথা ছিল, এক ধাক্কায় সেরে আসা যেত। কিন্তু দু'জনকে দুই আলাদা আলাদা দ্বীপেই থাকতে হবে, আমাদের ধকলের ষোল কলা পূর্ণ। একবার গিয়ে পড়তে পারলে খাতির যত্ন করে ওরা খুবই, চায়ের ব্যবস্থা করে, এটা ওটা সেটা কত কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করবে। তারপর ওঠার সময় হলে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য খাঁটি মধু গছিয়ে দেবে। পয়সা দিতে গেলে নেবে না কিছুতেই।

মনসারাম ও বাঞ্ছারামের সাথে আমাদের আলাপ গোসাবা দ্বীপেই। মধু বিক্রি করতে এসেছিল ওরা দু'ভাই। বিক্রিবাট্টা সেরে হাটের ধারে গোরাচাঁদের দোকানে বসে চা জিলিপি খাচ্ছিল ওরা। আমি আর প্রেমাংশুও চা খাচ্ছিলাম আর সতীপতি মানদাসুন্দরী স্কুলের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। প্রেমাংশুর স্কুল। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে ও। বছর দুই-আড়াই আগে এমনি বেড়াতে এসেছিল ও এখানে। এসে দেখে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কোনও ব্যবস্থাই নেই এই দ্বীপে। ল্যাংটো গদাই হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব। রোখ চেপে যায় তখন ওর। গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে জায়গা জমি কিনে, স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ফেলে একেবারে। শিক্ষিত বেকার ছেলেদের তো অভাব নেই এদেশে। ক্যানিং থেকে তাদের দু'চার জনকে ধরে এনে এখানকার স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে ও। এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় ওরা। ক্লাস এইট পর্যন্ত স্কুল। মাস্টারমশায়দের মোটামুটি মন্দ বেতন দেয় না প্রেমাংশু। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ প্রেমাংশুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অল্প-স্বল্প টাকা পয়সা দান করে সাহায্যও করে তার বন্ধুকে। মন্দ চলছে না স্কুল। প্রথম প্রথম অনেকেই বিদ্রূপ করত প্রেমাংশুকে। ঠেস দিয়ে কথা বলত, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে বলত। এখন কেউ তা বলে না। উল্টে তারিফই করে ওকে।

প্রেমাংশুর বাড়ি কলকাতায়। অধ্যাপনা করে সে। মাঝেমধ্যেই গোসাবায় যায়। স্কুলের হালচাল দেখে আসে। সঙ্গে থাকি আমি 'সর্বঘটের কাঁঠালি কলা'। বন্ধুর সাথে ঘুরে বেড়াই। ওখানকার পরিবেশ, মানুষদের কথাবার্তা ব্যবহার বেশ লাগে। ওখানে যাওয়া এখন একটা নেশাই। ক্রমে ক্রমে মনসারাম ও বাঞ্ছারামের সাথে আলাপ গাঢ়

হয়। সহজ সরল মানুষ। কাঁকড়া ধরে, মধু পেড়ে কায়ক্লেশে চলে ওদের। তবে হাসিখুশি সরল, আমুদে, গল্পে খুব। ওদের মুখে নানারকম সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনি আমরা। মনসারাম একবার একা হাতে কিভাবে এক ভয়ঙ্কর বাঘতে কব্জা করে এনেছিল তার চমকপ্রদ ঘটনা শুনি। শুনে গল্প লিখে ছাপিয়ে দিই। ছাপার হরফে সেই কাহিনীর সাথে নিজের নাম রয়েছে জেনে তার আহ্লাদ হয় খুব। ভক্ত হয়ে পড়ে সে আমার। বাঞ্ছারামও। আর প্রেমাংশু সম্পর্কে তো বরাবরই উঁচু ধারণা ওদের। প্রেমাংশুকে দেখলেই গদগদ হয় ওরা। আমাকেও সেই সঙ্গে বড় মোল্লাখালি, ছোট মোল্লাখালি দ্বীপে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

সেবার গোসাবায় এসে ছোট মোল্লাখালিতে যাব ঠিক করে রেখেছি। আগের বার এসে বড় মোল্লাখালি ঘুরে এসেছি। ছোট মোল্লাখালিতে যাবার ফুরসৎ হয়নি আমার। বাঞ্ছারাম রাগ করেছিল খুব।

এবারে এসে প্রথম দিনটা গোসাবায় কাটিয়ে পরের দিন সকালের দিকে ভট্‌ভটিতে চেপে চলেছি ছোট মোল্লাখালি দ্বীপে। মেঘলা মেঘলা দিন, সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া, শীত শীত ভাব, ভালোই লাগছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ মোতির সঙ্গে দেখা। মোতিউর। থাকে ছোট মোল্লাখালিতেই, বাঞ্ছারামের বাড়ির কাছাকাছি। গিয়েওছি ওর বাড়ি। বাঞ্ছারামের ওখানে যাচ্ছি জেনে উত্তেজিত হয়ে ও বললে, 'জানেন, বাগ আইয়েল বাঞ্ছাদার বাড়ি। এই তো কদ্দিন আগে। ইয়া বড়!'

'কী রকম?' শুনে উত্তেজিত আমরাও।

'হ্যাঁ, বাগ আইয়েল। কেন্তু বাগকে উচিত শেক্কা দে দেছে বেচারম আর কেনারাম, বাঞ্ছাদার দুই ছেলে মিইল্যে। জোর শেক্কা অ্যাক্কেরে। উফ!'

'যাঃ, কী বলছ যা তা। বেচারাম, কেনারাম তো ছোট। ওরা আবার কি শিক্ষা দেবে ওই অত বড় বাঘকে?'

'না গো, ঠিকই বলছি আমি চেত্তদা। আল্লার কিরে, বিশ্বেস করেন। আর মদুবালা, বোঝলেন চেত্তদা, বাঞ্ছাদার ডাগর সেই মেইয়েডা, কি আর ক'ব আপনেক, বাগের লেজই কেইট্যে দেছে একদম, হেঁসো দিয়া পুচোয় পুচোয়। সে এক দেরস্য। রক্তয় ভেইস্যে গেছলো চাদ্দিক অ্যাক্কেবারে!'

প্রেমাংশু শুনছিল এতক্ষণ চুপচাপ। আর পারে না এবার। মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক 'চুক চুক' শব্দ করে বলে, 'নাহ্, আর পারা যায় না, তোমার গল্পের ঠ্যালায় অস্থির যে আমরা মোতি।'

মোতিউর বোঝে না প্রেমাংশুদার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। ও দ্বিগুণ জোর দিয়ে বলে, 'তা হবেনই তো অন্তির। অন্তির না হয়ে পারেন? আমরাই হই, তো আপনেরা... কি কন চেত্তদা?'

বুঝলাম সবটা গাঁজা নয় হয়তো। গল্পের মশলাও থাকতে পারে মোতিউরের কথার মধ্যে। শোনাই যাক না কি বলে ও। বলি, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। বল না তুমি এবার, আসল ঘটনাটা শুনি।'

মোতিউর উৎসাহ পায়। বলতে শুরু করে, 'এই জুম্মাবারের দিন, বোঝলেন—বাঞ্ছাদা সেই পরভাতকালেই বড় ছেলে নিধিরামকে নিয়ি চইল্যে-গেছে বড় মোল্লাখালি মনসাদার বাড়ি। দুই ভাই আর নিধি মিইলে চাক ভাইঙবে, মধু পাইড়বে। বড় চাক, সব কাম সারতি দেরি হতি পারে। বেশি দেরি হলি দাদার ওইখেনে থেইকেই যাবে না হয় বাপ ব্যাটা দুইজনে। এই রকমই ইচ্ছে ছিল বাঞ্ছাদার। বারবার সুমায় কইয়েও গেছে তা পরিবারকে। ওদিকে সইন্দ্যে লাগতিই বাঞ্ছাদার বাড়ির আশপাশ দিয়ি প্রকাণ্ড অ্যাক বাগ ঘুরঘুর করতি থাকে।'

'কেন? হঠাৎ বাঘ কি আঁচ করতে পেরেছিল যে গর্জেন বলতে ওর বাড়িতে কেউ নেই সেদিন? বাঞ্ছারাম, নিধিরাম বাপ ব্যাটা দু'জনেই তো বড় মোল্লাখালিতে চাক ভাঙতে চলে গেছে তাই না। সেই সুযোগে হানা—কি বলো? বুদ্ধি রাখে ওরা খুব।'

'হ্যাঁ, তা তো রাখেই। সেই রকমই তো মনে আচ্ছে অ্যাখন। বাগের হেডে খুব মাথা। সব বোঝে ওরা।'

'তারপর কি হ'ল?'

'তারপর আর কি? সাঁঝের বেলা, বেচারাম আর কেনারাম হেরিকানের সামনে বুসে মুড়ি খাচ্ছেলো। মদুবালাও ছেল। মদুবালা বুসে খেতা সেলাই কুরতেলো।'

'আর বাঞ্ছার বউ সনাকা?'

'বাঞ্ছাদার পরিবার রান্না কুরতেলো টেমি জ্বালায়ে।'

'তারপর?'

'রান্না করতি করতি হঠাৎ কিরকম যেন সন্দ হয় বাঞ্ছাদার পরিবারের। নাক টানতি থাকে জোর জোর। কয়, 'কি রকম গন্দ আসতেছে রে বেচা-কেনা, পাচ্ছিস তোরা?'

বেচা-কেনা কয়, 'নাহ, পাচ্ছি না তো মা।'

বেচাকেনার মা রিইগ্যে যায়। কয়, 'গন্দ পাচ্ছিস নে? তোরা কি নাকের মাথা খেইয়ে বইসে আছিস যে সব।'

"মদুবালা কাতা সিলাই রেখ্যে জোরে জোরে নিশ্বেস টেইনে সুঁকতি থাকে। কয়, 'আমি গন্দ পাচ্ছি, মা। বোঁটকা মতো কি রকম যেন গন্দ, বাগ না তো!' কতি কতি ঠিক

সেই সুমায় বেচারাম কেনারমের চোখ পড়ে ঘরের বায়রা থিকি জাংলার শিকির ফাঁক দিয়ি গইল্যে ঘরে লেজ আইসা পইড়েছে ঘরের মদ্দি অ্যাক্কেবারে। লেজ দোলাচ্চেন বাগবাহাদুর। আর দেরি করে না উরা দুই ভাই ছুট্টে যেয়ে বাগের লেজ চেইপ্যে ধরে গায়ের জোরে। ভীষণ জোরে অ্যাক্কাবারে বোঝলেন।'

'ওরে বাবা!' প্রেমাংশুও অবাক হয় এবারে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে সে মোতির মুখের দিকে।

মোতিউর বলে চলে, 'উরা দু'ভাই ইপাশ থিকি লেজ টেইন্যে ধইর‍্যে রইছে প্রাণপণে। আর উপাশ থিকি বাগ লেজ ছাড়াতি চেষ্টা কুরতেলো তেমন। ছাড়াতি না পেইর‍্যে বাগ রাগের চোটে গলা দিই 'গর-গর' শব্দ করতি থাকে। বাঞ্ছাদার বাড়ির মাটির দিয়াল কুব মুটা, পুরু আর শক্তও তেমন। আর জাংলাও ছেল ভারি মজবুত। বাগ সুবিদে করতি পারে না। আসলে আচাম্বিতে লেজ কব্জা হেঁয়েল তো, ভইড়ক্যে গেছে উ বেচারা। ইদিকে লেজ নিয়ি চইল্যেছে টানাটানির খেলা। উরি টানামানি, উরি টানামানি। যুদ্দু অ্যাকেবারে। সে না দেখলি আপদের পেত্যয় হবি না ন্যে।'

'টাগ অব্ ওয়র আর কি!'

'কী কল্লেন চত্তদা?' মোতিউর বুঝতে চেষ্টা করে।

'না, ও কিছু না। তুমি ঘটনাটা বল তারপর?'

'শোনেন না, তারপর সে এক কাণ্ড! বাঞ্ছাদার ঘরের মদ্দি চেঁচামেচি শুরু হইয়্যে যায়। মদুবালাও তখন আর পারে না। খেতা সেলাই ফেইল্যে লাফায় উইঠ্যে হেসো হাতে নিয়ি ছুট্টে যেইয়ে কচ্ কচ্ কইর‍্যে পোচ লাগায় বাগের লেজের উপুর। লেজ কেইট্যে, কি আর কব আপনেগেরে, দুইখেন কইর‍্যে ফেলে সেই লেজের, ওই মদুবালা।'

'মাই গড্! তারপর কি হ'ল?'

'লেজকাটা বাগ ছাড়া পেইয়্যে অ্যাক্ ছুট্টে জোঙ্গলের মদ্দি ঢুইক্যে পৈল্যো।'

'এঃ! সর্বনাশ হ'ল তো। লেজকাটা বাঘ তো ঘুরে ফিরে আসরে আবার বাঞ্ছারামের বাড়ি। প্রতিশোধ নিতে আসবে না?'

'না, আর আসবি না ন্যে। তার মানে অচ্ছে আসতিই পারবি না ন্যে।' মোতিউরের কথায় দৃঢ় প্রত্যয়।

'কেন? কী করে বুঝলে?'

'বুঝার কি আছে ইর মদ্দি? বনবিবির পুইজ্যে দেকলাম তো আমর সবাই মিলে। ছোট মোল্লাখালির যত লোকজন। বড় মোল্লাখালি থেইক্যে বাঞ্ছাদার বড় ভাই মনসাদা, মনসাদার পরিবারে আরও অনেকে এইছিল। মোচ্ছব হইল্যো। বিরাট ব্যাপার।'

'তবে আর কি। বাঞ্ছারাম তবে নিশ্চিন্ত. কী ব'ল?'

'তাই-ই তো আল্লার দোয়ায় কোনও চিন্তে নাই আর এখন বাঞ্ছাদার।'

'কেন, আল্লার দোয়ায় কেন, বনবিবির কৃপাতে ব'ল।'

'আল্লাই তো সব—' মোতিউর জোর দিয়েই বলে কথাটা। বলে ভট্‌ভটি থেকে নামার জন্যে প্রস্তুত হয়। ভট্‌ভটি ঘাটে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে।

ছবি : সমীর দাশ

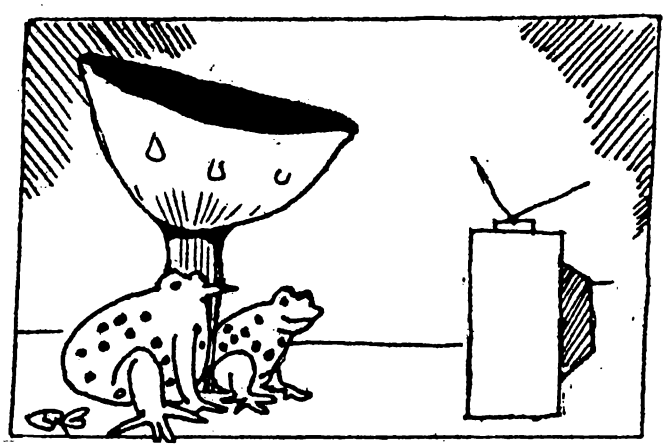

(প্রচলিত গ্রামীণ লোককথা)

রুনু ঝুনু ও একানড়ের গল্প

দীপাঞ্জন রায়

গাঁয়ের কিনারায় ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে থাকত গরীব এক বুড়ি আর তার দুই নাতনী-রুনু আর ঝুনু। তাদের কুঁড়ের কাছেই একটা বিরাট তালগাছের মাথায় ছিল এক একানড়ের আস্তানা। সারাটা দিন সে এই তালগাছের পাতার আড়ালে চুপটি করে বসে থাকত। আর রাত হলেই নেমে এসে এক পায়ে সারা গাঁ ঘুরে গেরস্তের গরু, ছাগল, বাছুর—যে দিন যা পেত তাই খেয়ে নিত। তবে তার সবচেয়ে বেশি লোভ ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর। কেউ যদি কখনও রাতের বেলায় দোর বন্ধ না রাখত তবে সে বাড়ির ছেলে বা মেয়ের আর রক্ষে থাকতে না। এই একানড়ের বহুদিনের সাধ ছিল রুনু-ঝুনুকে ওর খাওয়ার। কিন্তু সন্ধে থেকেই বুড়ি তাদের কিছুতেই চোখের আড়াল করত না।

বুড়ি বেত দিয়ে কুলো, ধামা—এই সব বুনত আর আশপাশের গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে সে সব বেচত। এতে সামান্য যেটুকু পয়সা রোজগার হ'ত তাই দিয়ে কখনও আধপেটা খেয়ে, কখনও বা উপোস করে কোনও মতে তাদের দিন চলত।

একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে বুড়ি তার নাতনীদের ডেকে বলল, 'ওরে রুনু-ঝুনু এভাবে এগাঁয়ে ওগাঁয়ে ঝুড়ি বেচে তো আর তা চলছে না। শুনেছি শহরের বাজারে নাকি এ সবের দাম অনেক বেশি। তা আমি যদি একদিনের জন্যে শহরের বাজারে যাই সাবধানে একটা রাত্তির তোরা সাহস করে কাটিয়ে দিতে পারবি না?'

রুনু-ঝুনু বলল, 'ও মা, সে আর বেশি কথা কি, আমরা তো এখন বড়ে হয়ে গেছি ঠাক্‌মা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শহরে ঘুরে এস।'

'তুমি কিছু চিন্তা করবে না ঠাক্‌মা। সুয্যি ডোবার আগেই আমরা ঘরের দোর দিয়ে দেব। পরের দিন সকালের আগে খুলবই না। তাহলে তো ও কিছুই করতে পারবে না।'

'হ্যাঁরে সোনামণিরা, রাতের বেলায় কেউ হাজার বার ডাকলেও দোর খুলবি নে। তাহলে কালই আমি শহরপানে যাব। এ কথা তোরা কাউকে জানাস নে। আর শোন! ঠাকুর ঘরে আমি একটা জাদু পিদিম রেখে যাব। যদি কখনও কোনও বিপদে পড়িস তবে ওই পিদিমটা জ্বালিয়ে দিবি। তাহলে আমি যেখানেই থাকি না কেন ঠিক তক্ষুনি এখানে চলে আসব।'

'হ্যাঁ, আরেকটা কথা শুনে রাখ। একানড়ে কিন্তু এমনিতে মরে না। তবে আগুনকে তার খুব ভয়। একানড়েকে আগুনে পুড়িয়ে একটা মন্ত্র যদি ঠিকঠাক বলতে পারিস তবেই সে মরবে। সেই

মন্ত্রটাও আমি লিখে রেখে দিয়ে যাব তোদের কাছে। তবে খুব সাবধান! তাকে আগুনে পুড়িয়ে যদি মন্ত্রটি না বলিস, তাহলে কিন্তু সে আরও বেশি জোর পেয়ে যাবে।'

রুণু-ঝুনু এ সব কথা জেনে নিয়ে তাদের ঠাক্‌মাকে অভয় দিয়ে বলল, 'এরপর তো আর তোমার কোনওরকম চিন্তাই করার দরকার নেই। কালই তুমি রওনা দিতে পার ঠাক্‌মা।'

বুড়ি আর রুণু কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও টের পেল না যে ঠিক সেই সময়ে ওই একানড়ে তাদের সমস্ত কথা জানালার ওপাশ থেকে শুনে রাখল। জিভে জল এসে গেল তার। মনের আনন্দে সে ভাবতে লাগল, অ্যাদ্দিন পর আমি রুণু-ঝুনুর নরম তুলতুলে মাংস খাওয়ার সুযোগ পাব।'

পরদিন বুড়ি রুণু-ঝুনুকে জাদু পিদিম আর মন্ত্র লেখা একটা কাগজ দিয়ে বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ল। রুণু-ঝুনুও তাদের ঠাকুরমার কতামতো সব কাজকম্ম সেরে রেখে সুয্যি ডোবার আগেই দরজা জানলা বন্ধ করে দুই বোনে মিলে ঘরের মধ্যে বসে গপ্প করতে লাগল।

সেদিন রাত নামতেই হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভয়ানক এক ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল গাঁয়ের ওপর। আর সেই সঙ্গে আঝোর ধারায় ঝরতে লাগল বৃষ্টি। রুণু-ঝুনু তো ঘরের মধ্যে জড়োসড়। এই বুঝি ঝড়ের দাপটে তাদের খড়ের চাল গেল উড়ে! এই বুঝি বৃষ্টির ঝাপটায় দরজাটার কপাট গেল খুলে।

এমন সময়ে তাদের দরজায় একটা আওয়াজ হল—'খট্-খট্, খট্-খট্-খট্! দুই বোনে তো ভয়ে এ ওর মুখের পানে তাকায়, ও তাকায় এর মুখের পানে! হঠাৎ বাইরে থেকে কে বলে উঠল, 'ওঁরে রুণু-ঝুনু, আমি তোঁদের ঠাঁক্‌মা। এঁই ঝঁড় বৃষ্টিতে মাঝপথে আঁটকে পড়ে আঁর শহর যেঁতে পারিনি। কোনওমতে ভিঁজে সঁপসপে হয়ে ফিঁরে এঁয়েছি। তোঁরা দোর খোঁল রেঁ!'

রুণু-ঝুনুর সন্দেহ হ'ল—সত্যিই ঠাক্‌মা তো? তারা পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে বলল, 'তুমি যদি ঠাক্‌মাই হবে তাহলে অমন নাকি সুরে কথা বলছ কেন? তাছাড়া তুমি তো কেউই ডাকলে দোর খুলতে নিষেধ করে গেছ?'

'আঁরে এঁই বিঁষ্টিতে ভিঁজে আমার ঠাণ্ডা লেঁগেছে রে বোঁকা মেয়ে দুটো! অ আঁর তাছাড়া যাওয়ার আঁগে তোঁদের আমি জাঁদু-পিদিম দিঁয়ে গেলাম, মন্তর লিঁখে দিঁলাম—এঁসব বঁলার পরও তোরা বুঁঝতে পাঁরছিস না। আমিই তাঁদের ঠাক্‌মা? ওঁরে তোঁরা আমাকে ভেজাসনে, দোরটা এবার খোঁল।'

রুণু-ঝুনু দেখলে —তাই তো! এসব কথা তো ঠাক্‌মা ছাড়া আর কারুরই জানার কথা নয়, এ তাহলে সত্যি ঠাক্‌মা! তারা দরজা দিল খুলে। আর ঝোড়ো হাওয়ায় নিভু নিভু লণ্ঠনের আলোয় তাদের ঠাক্‌মাও ভিজে থানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জড়ানো অবস্থায় চট করে ভেতরে ঢুকে গেল। তারা দরজাটা ভালো করে লাগাতে লাগাতে শুনল, তাদের ঠাকুরমা বলছে, 'হ্যাঁরে, জাদু-পিদিমটা কই, কোথায় রাঁখলি? দেঁ ওঁটা তুলে রাখি। ওঁসব জিনিস বাঁইরে যঁত কম থাঁকে তঁতই ভালো। আর হ্যাঁ, মন্তর লেখা কাঁগজটাও দেঁ। আঁর তো ওঁগুলার দঁরকার নেই।'

পিদিমটা নিয়ে ঠাকুরমা উঁচু তাকের ওপরে রুণু-ঝুনুর নাগালের বাইরে রেখে দিল। আর কাগজটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে টুকরোগুলো ফেলে দিল আস্তা কুঁড়ের মধ্যে।

রুণু-ঝুনু বলল, 'তোমায় চাট্টি মুড়ি মেখে দিই ঠাক্‌মা? আমাদের তো রাতের খাওয়া সারা হয়ে গেছে অনেক আগে।'

ঠাকুরমা কিন্তু কিছুই খেল না। খালি বলল, 'তোঁরা এঁখন ঘুমো গেঁ যাঁ—আমি দুঁ-একটা কাজ সেরেই শুঁয়ে পড়ব।'

রুণু-ঝুনু ঘুমোতে গেল। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে। তবে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে তখনও। অনেক রাতে ঝুনু হঠাৎ শুনতে পেল রান্নাঘর থেকে খ্যাঁশ খ্যাঁশ করে একটানা একটা শব্দ ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে উঠে এসে পা টিপেটিপে রান্না ঘরের দিকে গেল। গিয়ে যা দেখল তাতে তো তার চক্ষুস্থির! তাদের ঠাকুরমা সবেচেয়ে বড় ছুরি নিয়ে নিজেরই একটা মাত্র লোমশ কালো পায়ের ওপর ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ করে শান দিচ্ছে, আর বিড় বিড় করে কি যেন বলছে! কোনওমতে ফিরে এসে ঝুনু তো ভয়ের চোটে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। রুণুর ঘুম গেল ভেঙে, 'কি রে বোন, কাঁদছিস কেন? কি হল তোর?'

ঝুনু কোনওমতে সব কথা বলতে রুণুরও মাথার চুল গেল খাড়া হয়ে। সে বললে, 'সব্বোনাশ! এতো সেই একানড়েটা না হয় যায় না। হায়রে বোন, আর তো আমরা বাঁচতে পারব না রে! ওযে জাদু-পিদিমটাও তুলে রেখেছে—মন্তটারও তো নষ্ট করেছে, তাহলে?'

তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে একটা উপায় ঠাউরে রুণু ঝুনুকে চুপ করে শুয়ে পড়তে বলে ঘুম-জড়ানো গলায় ডাকতে লাগল—'ঠাক্‌মা, ও ঠাক্‌মা, শুনছ?'

একানড়ে বিরক্ত হয়ে ভাবল, কি আপদ, এদের আবার ঘুম ভাঙল কেন?

থানটাকে ভালো করে গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে সে তাদের ঘরের কাছে এসে বলল, 'কিঁ রেঁ কি চাঁস তুঁই এঁত রাতে?'

মাথার ঘোমটার নিচে অন্ধকারে তার লাল চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছিল। ভয়ে রুণুর গলা শুকিয়ে গেল, তবু সে বলল, 'বা রে, এ সময়ে আমি রোজরই তো বাইরে একবার ইয়ে করতে যাই! আগুনটা উস্‌কে দিয়ে লণ্ঠনটা আমায় এগিয়ে দেবে চলো।'

একানড়ে দেখলে এতো ভারি জ্বালা। সে ভাললে বুড়ি নিশ্চয়ই রোজ রাতে রুণুকে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে দেয়। কিন্তু তার পক্ষে তো আগুন নেওয়া বড়ই মুস্কিল ব্যাপার। সে তখন বলল, 'বিষ্টিতে

ভিজে আমার শরীরটা আজ বড় ভাঁলো নেই, আজ মানে, বেরোতে ঠিক... তুঁই,...তুঁই ঝুনুকে বল না এঁগিয়ে দিতে।'

মনে মনে কিন্তু সে ভাবল, বাইরে থেকে এস না খুকুমণিরা। নেহাৎ একানড়ের ছুরিটা ভালো করে ধার দেওয়া হয়নি। এস না তোমরা, আমি ততক্ষণে আর একটু শান দিয়ে নিই। তারপর নিশ্চিন্তি মনে নুন মাখিয়ে তোমাদের কচি কচি মাংস খেতে যা মজা—ওঃ। বুড়ি বেচারি কাল এসে নাতনীদের হাড় ক'খানিও দেখতে পাবে না।

ওদিকে রুশুও চাইছিল যে একানড়ে ঝুনুকে সঙ্গে নিয়েই বের হতে বলুক। সে তো এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল। দুই বোন বাইরে বেরিয়ে আস্তে করে বাইরের দরজার শিকলটা আটকে দিয়ে লণ্ঠনটা থেকে তাদের খড়ের চালে আগুন ধরিয়ে দিল। ঝোড়ো হাওয়ায় বৃষ্টির জল শুকিয়ে গেছিল একেবারে। কাজেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

কিন্তু হায়রে কপাল। তখনই তাদের মনে পড়ে গেল ঠাকুরমার কথা। তাদের কাছে সেই মন্ত্র তো নেই। তাহলে? তাহলে আগুনে পুড়ে একানড়ে যে আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে? পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব একানড়ে তো বিষম জোরে চলতে পারে।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই রুশু-ঝুনু দেখল ভয়ানক মূর্তিতে একানড়ে জ্বলন্ত অবস্থায় ধেয়ে আসছে ওদের পানে, আর বিকট চীৎকার করছে, 'ওঁরে রুশু-ঝুনুরে তোঁদের মনে এঁই ছিঁল রেঁ? আমায় তোরা পুড়িয়ে মারলি রেঁ?'

এই বুঝি তাদের ধরে ফেলল একানড়ে। আর বাঁচা হল না রুশু-ঝুনুর। ভয়ে কেঁদে উঠল তারা। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়েই সেখানে এসে গেল ওদের সত্যিকারের ঠাকুরমা। ওমা একি অবাক কাণ্ড! ঠাকমা কি করে এখন এখানে এল?

আসলে হয়েছেটা, কি ঘরদোর সব পুড়তে পুড়তে তো তাকের ওপরে রাখা সেই জাদু পিদিমের পলতেটাতেও ধরে গেছে আগুন। আর বিপদ বুঝে ঠাকুরমা তো কথামতোই হাজির হয়েছে সেখানে। তারপর আর কি, ঠাকুরমার তো মন্ত্রটা জানাই ছিল। সুর করে সেটা বলতেই একানড়েটা একেবারে ছাই হয়ে গিয়ে ঝুর ঝুর করে পড়ে গেল। দমকা একটা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল সে ছাই। যাক চিরকালের মতোই একটা আপদ চুকল।

কিন্তু বুড়ির ঘর! ঘরখানাও যে পুড়ে ছাই! বুড়ি তো কাঁদতে বসে গেল। কিন্তু একানড়ের চীৎকার আর রুশু-ঝুনুর কান্নার আওয়াজে যে ক'জন গাঁয়ের লোক দোর ফাঁক করে বা জানলার ছ্যাঁদা দিয়ে সব ঘটনা দেখেছে তারা কি আর বুড়িকে কাঁদতে দেখে তারা হই হই করে গোটা গাঁয়ে সুখবরটা জানিয়ে দিল। তারপর? গাঁয়ের সব লোকজন মিলে বুড়িকে গাঁয়ের ঠিক মধ্যিখানে সুন্দর একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিল। ভালো দেখে একখানি দো-আঁশ মাটির জমিও পেল বুড়ি। সে এখন সেখানে নানা সবজী ফলিয়ে হাটে বেচে। আগের মতো অভাব আর তার নেই—সে এখন নাতনীদের নিয়ে মনের সুখেই দিন কাটায়।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

তা দেখে

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

হরেরাম কর, সিধু মণ্ডল
রেলের নিত্য যাত্রী,
সকালে বেরিয়ে এক সাথে বাড়ি
ফেরার সময় রাত্রি।
রোজ দেরি হয় গোছ গাছ ক'রে
বাড়ি থেকে বা'র হতে,
ভর পেটে খেয়ে হাঁটা বড় দায়
স্টেশন যাওয়ার পথে।

অথচ তাঁদের ধরতেই হবে
সাড়ে আটটার গাড়ি,
হরেরাম কর, সিধু মণ্ডল
পা চালান তাড়াতাড়ি।
তা দেখ ওঁদের পরিচিত জন—
যারা থাকে পাশাপাশি
কর-মণ্ডল এক্সপ্রেস যায়
বলে করে হাসাহাসি।

হাত পাকাবার আসর

- হাত পাকাবার আসর শুধুমাত্র ১৭ বছরের কম-বয়েসি 'সন্দেশী' গ্রাহক -গ্রাহিকাদের জন্য।
- 'সন্দেশ'-সম্পাদকদের পছন্দ অনুযায়ী গল্প, ছড়া ও কবিতা, ছবি, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ধাঁধা ইত্যাদি সবকিছুই ছাপানো হয়।
- ছাপার জন্য যে কোনও লেখা কাগজে একদিকে পরিষ্কার করে লিখবে। ছবি আঁকতে হলে শুধুমাত্র কালো কালি ব্যবহার করবে। যে-সব স্কুল, ক্লাব ও লাইব্রেরি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক সেখানকার সমস্ত ছাত্র বা সদস্য
- 'হাতপাকাবার আসর'-এর জন্য ছবি ও লেখা পাঠাতে পারো। সব লেখা ও ছবির সঙ্গে তোমার নাম, গ্রাহক নম্বর ও বয়েস স্পষ্ট করে লিখবে।

পি · সি · চন্দ্র

জু · য়ে · লা · র্স

সন্দেশীরা শোনো, ভারী মজার খবর! বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান **পি. সি. চন্দ্র এন্ড সন্স** তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ছোটদের কচি হাতে 'বড়' কাজ হয় 'হাত-পাকাবার আসর'-এ, তাই খুশি হয়ে বড় মানুষেরা এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। ভালো খবর নয়? তোমরাও আঁকায় লেখায় ওই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের গুণপনা দেখিয়ে খুশি করো।

প্রোজেক্ট

রূপকথা ভট্টাচার্য

গ্রাহক নম্বর ৩৯২০। বয়স ১২

স্কুলবাড়ির পিছনে প্রকাণ্ড একটা খোলা মাঠ। ছুটির পর বা টিফিনের সময় বেশির ভাগ ছেলেরা নেমে যায় মাঠে। তাদের হাতে হয় সাদা-কালো বরফি কাটা ফুটবল নয়তো ক্রিকেট ব্যাট, ক্যাম্বিস বল আর তিনটে উইকেট। পিটি স্যারের কাছ থেকে বল নিয়ে দিব্যি খেলা যায় টিফিন ব্রেকের সময়। পিটি ক্লাসের ঘণ্টা পড়লেও ছেলেদের মধ্যে চাঞ্চল্য। আগের ক্লাসের অঙ্কের ম্যামের কথা মাথায় না ঢুকলেও 'ইয়েস ম্যাম' বলে মাথা নেড়ে দেয় ওরা। আর যেই ম্যাম ক্লাসের বাইরে পা রেখেছেন ওমনি ক্লাসে শুরু হয়ে যায় ভূতের নৃত্য। আনিকেত আর অভিষেক 'ডন'-স্যারের পিছনে ছোটে, 'স্যার স্যার, উইকেট স্যার উইকেট।'

ডন-স্যারের লাঠির ভয়ে সকলে ঠাণ্ডা। সেই বিখ্যাত সরু লাঠিই দেখালেন ডন-স্যার অভিষেক আর অনিকেতকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা লেজকাটা হনুমান এসে জুটেছে। স্যার বললেন, 'অ্যাই অ্যাই, মেক এ লাইন বয়েজ।'

ব্যস। সকলে শুরু করে দিল, 'কালকের ওয়ান ডে-টা দেখেছেন স্যার?'

ছেলেরা ক্রিকেট খেলতে চলে যেতেই মেয়েদের খেলা শুরু। স্যার হাজির, হাতে বেসবল, লাঠি আর উইকেট। মেয়েদের মাথায় হাত। এতদিন পিটি ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করে শেষে কি না বেসবল। সবাই চেঁচালে, 'স্যার, আমরা বেসবল খেলব না স্যার।'

শুভ্রস্যার বললেন, 'দেন ইউ ডু থিওরি।'

'অ্যাঁ।' সকলের চোখ কপালে ওঠে। থিওরি মানেই তো স্যারের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া লেকচার। না না, তার চেয়ে ওই বেসবল খেলাটাই ভালো ছিল। মেয়েরা প্রতিবাদ করে, 'না স্যার, না স্যার।'

'তোমাদের এবারের প্রোজেক্ট ওয়ার্ক, দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট। বুঝেছ?'

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক অফ্ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট— এটা স্যার কি বলছেন? অহনা স্যারকে প্রশ্ন করে, 'মেয়েরাও এই প্রোজেক্ট করবে?'

'ইয়েস। বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস্।' শুভ্রস্যারের হতাশ করে দেওয়া উত্তর।

ছেলেরাও করবে? তার মানে ওই অনিকেত, অভিনন্দন— ওই হনুমানগুলোর কেউ একজনই হায়েস্ট পাবে? ওদের তো শচীন-সৌরভের প্রতি ম্যাচের স্কোর পর্যন্ত মুখস্ত।

সকলের মতো চিন্তিত ঝুম্পাও। ওর তো লেগ বিফোর উইকেট, মিড-অন্, মিড-অফ্ কাকে বলে, হিট উইকেট কি করে হয়, তাই জানা নেই, তো আবার ক্রিকেটারদের স্কোর।

বেল বেজ ওঠে—'ঢঙ -ঢঙ -ঢঙ -ঢঙ'। শুভ্রস্যার 'থ্যাঙ্কু' বলে চলে যান।

ছেলেরা লাইন করে এসে ক্লাসে ঢোকে। সুলগ্না শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ওদিকে অভিনন্দন শুরু করেছে নাক বোঁচা সুলগ্নাকে ক্ষ্যাপাতে—'চাইনিজ টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি', আর চিন্তিত অহনাকে 'স্টাইলি বুড়ি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি'। অনেক ছোট চেহারার দেবাঞ্জনকে ক্রিকেটের বলটা খেলার মতো দেখিয়ে সমানে বলে চলেছে, 'আয় বাচ্চা, কোলে আয়। আয় বাচ্চা, কোলে আয়।' দেবাঞ্জন বলটা নিয়ে লাস্ট বেঞ্চ থেকে ছোঁড়ে —সেটা এসে পড়ে ঠিক দরজার সামনে। অনিকেত হাততালি দিয়ে বলে আর দেবু, 'তুই তো হরভজন সিং হতে যাচ্ছিস।'

ঝুম্পা আর অভিষেককে ক্লাস টিচার একই বেঞ্চে বসিয়ে দিয়েছেন। হয়তো খরগোশ আর হনুমানের ব্যালেন্স আনার জন্য। ঝুম্পা একবার ইনিয়ে বিনিয়ে অভিষেককে জিজ্ঞেস করে, 'অ্যাই, ক্রিকেটে ক'রকমের আউট আছে রে? একটা রান আউটি, একটা কট আউট, একটা...'

'থাক থাক, অনেক হয়েছে— তোর আর ক্রিকেটের ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার নেই। তোদের সাথে ক্রিকেট নিয়ে কথা বললে ভারতীয় ক্রিকেট টিমে কারা আছে তাও ভুলে যাব।' অভিষেকের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর।

কিছুক্ষণ বাদে আবার শেষ চেষ্টা করে ঝুম্পা, 'আচ্ছা, এই সব ক্রিকেটারদের স্কোর-টোরগুলো কোথায় পাবো বলতো?'

'আবার। নাঃ, এবার ক্রিকেটের বানানও ভুলে যাবে। অনেক এনসাইক্লোপিডিয়া আর জেনারেল নলেজের বই আছে আমাকে আর জ্বালাস না তো। ওফ্, সত্যি এই মেয়েগুলো না—' অভিষেক দুমদাম পা ফেলে স্কুলের গেটের দিকে চলে যায়।

ক্লাস তখন প্রায় ফাঁকা। সায়ন কুণ্ডু ওরফে শয়ন কুণ্ডু আর প্রতীক মুখার্জী ঝড়ের বেগে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। সুলগ্না চিন্তিত মনে একপাশে বসে আপেল খেয়ে চলেছে। সব মেয়েরাই চুপচাপ। সোমদত্তা এসে ঢোকে। বলে, 'অ্যাই, জানিস তো সোমবার হচ্ছে প্রোজেক্ট জমা দেওয়ার ডেট। কি করবি রে? ওরে বাবা, কি একটা ছেলেমার্কা প্রোজেক্ট রে!'

অহনা বলে, 'নিশ্চয়ই ওই অন্তরীপটা সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে। ও তো আজকেই গড় গড় করে গত ম্যাচের 'ক' থেকে 'বিসর্গ' অবধি বলে গেল।'

শুক্রবার বাংলা বনধ্। ফোক্‌টে ছুটি। বাড়ি ফিরে ঝুম্পা হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসে বলে, 'মা, প্রোজেক্ট করতে হবে ক্রিকেটের ওপর।'

মা চোখ কপালে তোলেন, 'প্রোজেক্ট আবার! মা'র মনে পড়ে ক্লাস ফোরে 'হরিয়ানা', তারপর ক্লাস ফাইভে 'ফুড' আর সিক্সে পশ্চিমবঙ্গের ওপর প্রোজেক্টটা। তার সেগুলো উদ্ধার করা গিয়েছে তিন ভাগ মা'র আর একভাগ মেয়ের প্রচেষ্ঠায়। এখন সেভেনে আবার প্রোজেক্ট, তার ওবার ক্রিকেটের উপর! মা স্তব্ধ।

ঝুম্পা আবার বলে, 'কি হবে প্রোজেক্টে, অ্যাঁ? মাত্র তো দু'দিন। বাবাও অফিস বাড়ি, দশবার চা আর ঘুমের রুটিনে চলেন। অথাৎ চিন্তা এখন সব মায়ের। কি কার যায়। দৌড়লেন পাশের বাড়ির ক্রিকেট পাগল- উৎসবের কাছে। জোগাড় হ'ল ক্রিকেটের একটা খেলনা। লাল আলো দিয়ে আউট, বাউন্ডারি, মিড-অন, সিলি-মিড-অন ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। ঝুম্পা এদিকে ফোন করল খুড়তুতো দাদা পাপাইকে। তার সংগ্রহশালা থেকে ক্রিকেটারদের ঠিকুজী-কুষ্ঠি জোগাড় হ'ল। ক্রিকেটের তথ্যের মাল-মশলা বোঝাই হ'ল। তারপর রবিবার। সারাদিন ধরে বসে বসে মা মেয়ে তৈরি করল প্রোজেক্ট। নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠল মেয়ে ও মায়ের। অন্য সব পড়া পড়ে রইল এক পাশে। ঝুম্পার তখন একটাই চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে, 'দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ্ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট'।

মা মেয়েতে দরজা বন্ধ করে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করছে বুঝতে পেরে কেউ আর ওদের বেশি ঘাঁটাল না। দাদু, দিদা, বাবা সবাই সন্ত্রস্ত। অবশেষে তৈরি হ'ল সেই প্রোজেক্ট। প্রোজেক্ট অন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট।

সোমবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে প্রোজেক্ট গেল ঝুম্পার সাথে স্কুলে। মেয়েদের মাথায় শুধু চিন্তা ২০ নম্বরের মধ্যে অন্তত ১০ নম্বর পেতে হবে। শুভ্রস্যার ক্লাসে এসে ঘোষণা করলেন প্রোজেক্টের ফল বেরোবে সোমবার। দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা সপ্তাহ। সোমবার এসে গেল পি.টি. পিরিয়ড। ছেলেদের কুছ পরোয়া নেই ভাব হলেও মেয়েদের বুক দুরু দুরু। ঝুম্পারও তাই অবস্থা। ক্লাসে এসে শুভ্র স্যার বললেন, 'দু-একজন খুব বাজে করেছে।' তিনি ডাকলেন, 'রোল নম্বর থ্রি।

রোল নম্বর তিন ঝুম্পার, 'অ্যাঁ, আ-আ-আমি, আমি পাশ করিনি স্যার?' ঝুম্পা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ভালো ছেলেরা অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। সবচেয়ে বাজে করেছে ঝুম্পা।

শুভ্রস্যার তখনও বলে চলেছেন, 'ক্রিকেটটা ছেলেদের কিন্তু একচেটিয়া নয়। ইচ্ছে করলে মেয়েরাও ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে। কিন্তু তাদের ছোট থেকেই এই খেলার উৎসাহ দেওয়া হয় না। আর সেটাই আজ প্রমাণিত হ'ল।' সকলে এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। 'এই প্রোজেক্টে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে রোল থ্রি। ঝুম্পা ভট্টাচার্য। ও পেয়েছে ২০তে ১৮। ভেরি গুড, অভিনন্দন ঝুম্পা।'

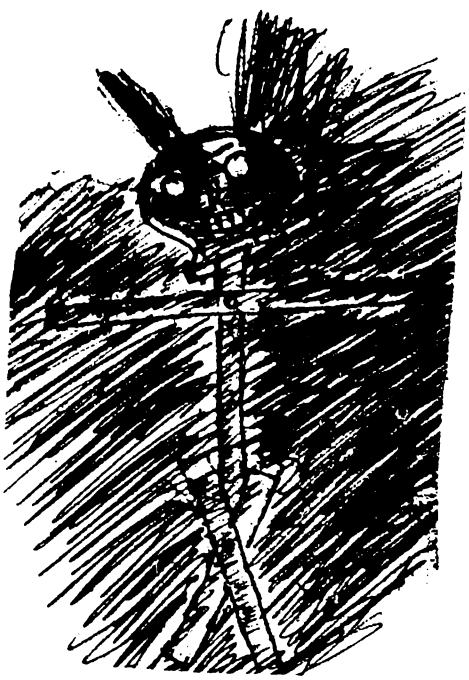

অতনু কুমার
গ্রাহক নং ৩৫০০। বয়স ?

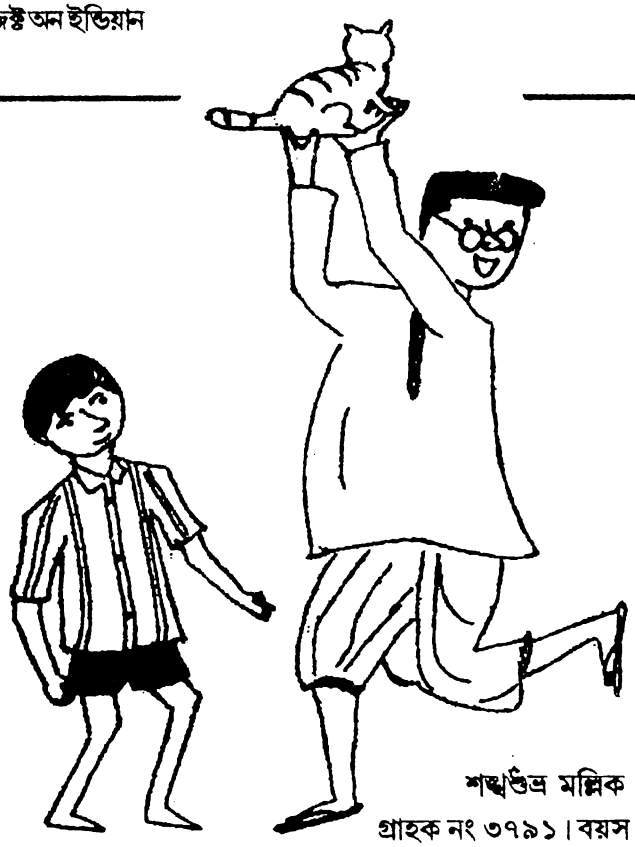

শঙ্খশুভ্র মল্লিক
গ্রাহক নং ৩৭৯১। বয়স ৯ বছর

বেড়াল

শঙ্খশুভ্র মল্লিক
গ্রাহক সংখ্যা ৩৭৯১। বয়স ৯

বেড়ালকে আমি কোনও দিনই খুব একটা ভালো চোখে দেখতে পারি না। তার অবশ্যই যথেষ্ট কারণ আছে। অনেকেই বলেন, বেড়াল নাকি বাঘের মাসি। এর কারণটা কোনও দিনই আমার বোধগম্য হয় না। বাঘের গায়ের রঙ আর বেড়ালের গায়ের রঙ কখনও এক নয়। বাঘের গায়ে হলদের উপর কালো ডোরাকাটা একটা নির্দিষ্ট রঙ আছে। সাদা বাঘও কিছু আছে বটে। কিন্তু বেড়ালের কোনও নির্দিষ্ট রঙ নেই—কোনওটা সাদা, কোনওটা কালো, কোনওটা খয়েরী আবার কোনটা বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ। বাঘের ওই গুরুগম্ভীর 'হালুম' ডাক শুনলেই গা-টা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। আবার বেড়ালের 'মিঁয়াও' শুনলেও গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে। বাঘ চলাফেরা করে বীরদর্পে। আর বেড়াল চলে চুপিসাড়ে, ধীর পায়ে। বাঘ শিকার ধরে শিকারের পেছনে দৌড়ে, অনেক পরিশ্রম করে। কিন্তু বেড়াল? আপেক্ষা করে কখন গৃহস্থের অসাবধানতায় চুরি করে খাবে। কেউ কোনও বীরোচিত কাজ করলে তাকে আমরা বাঘের সঙ্গে তুলনা করি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বলে। আমার মনে হয় তাতে সে গর্ববোধ করে। কিন্তু তাকে যদি বাঘের মাসি অর্থাৎ বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করে 'রয়েল বেঙ্গল ক্যাট' ডাকি সে কি তা শুনে গর্ববোধ করবে? আমার তো তা মনে হয় না।

অনেকেই বেড়াল পোষেন। সেই সব বেড়ালের প্রতি তাদের আচরণ দেখলে আমার সর্বদাই রাগ হয়। এরও অবশ্য একটি কারণ আছে। আমার মাসির বাড়িতে একটা বেড়াল আছে। আমি যখনই মাসির বাড়িতে যাই তখনই আমি বেড়ালটাকে দেখতে পাই মেজাজে তিনি সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়চ্ছেন। তিনি যখন যাওয়া আসা করেন আমাকেই সরে গিয়ে পাশ দিতে হয়। একদিন আমি, বাবা, মা, মাসি, মেসো সবাই মিলে খাটের উপর বসে জমিয়ে গল্প করছি। বেড়ালটি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রথম খাটের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ একলাফে একদম মেসোর কোলে। মেসো অমনি তাকে ভুঁড়ির উপর বসিয়ে মুখে মুখ লাগিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি আদর! বেড়লের থেকে নাকি ডিপথিরিয়া এবং কৃমি রোগ হয়। বেড়ালের মল ত্যাগের সময় কৃমির ডিম লোমে লেগে থাকে। বিড়ালের লোমে হাত দিয়ে সেই হাত মুখে দিলে বা বিড়ালের লোম পেটে চলে গেলে কৃমির ডিম আমাদের শরীরে ঢুকে যায়। তাতেই আমাদের কৃমি হয়। সে সব দিকে মেসোর নজর আছে বলে আমার মনে হয় না। সে যাই হোক—তারপর সেটি কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ মেসোর নধর ভুঁড়িটাকে নাচিয়ে প্রথম কাঁধে তারপর মাথায় চড়ে বসল। অমনি মেসো চৈতন্যদেবের মতো হাত দুটো মাথার উপরে তুলে সেটাকে ধরে কি আদর, নৃত্য! এই সব আদিখ্যেতা আমার কোনও দিনই সহ্য হয় না। অথচ এই মেসো আর মাসি যখন তখন আমাকে দেখলেই আমার বাবা-মাকে জ্ঞান দিয়ে বলেন, তোদের একমাত্র ছেলে তা বলে বেশি আদর দিয়ে মাথায় তুলিস না। শেষে মানুষ না হয়ে বাঁদর তৈরি হবে।' বেড়ালটাকে তো মাথায় তুলতে হল না। সে তো আপনিই উঠল—কই সে তো বাঁদর হ'ল না! হলেও বাঁচতুম অন্তত এখন মানুষের পূর্বপুরুষ হ'ত। পরে মানুষ হবার আশা থাকত।

একদিন আমি বাড়িতে খাটের উপরে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে জ্যেঠিমা আমার মাকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। মা ছুটে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে যখন ঘুরে এল তখন মাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করাতে মা বলল, যে মাসির সেই পোষা বেড়ালটার নাকি চারটে বাচ্চা হয়েছে— তার মধ্যে অবশ্য একটি অপলকা। আমাদের বাড়ির ফোন খারাপ তাই মাসি এই আনন্দ সংবাদটা জানানোর জন্য পাশের বাড়িতে ফোন করেছিল।

এর দু'দিন বাদে আমাদের বাড়িতে আমার মাসির ফোন। মায়ের সঙ্গে ফোনের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে সেই অপলকা বেড়ালটি পটল তুলেছে। এই শোক সংবাদটা জানানোর জন্যে মাসির ফোন। ফোনটা শেষ হতে আমি মনে মনে বললাম বেড়ালটা তো পরলোকের টিকিট কেটেই এসেছিল। খালি ট্রেনে চাড়ার অপেক্ষায় ইহলোকের বিশ্রামাগারে ক'দিন অপেক্ষা করছিল মাত্র। মা শুনে বললে, 'বেড়াল অবলা জীব তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করা তোমার ঠিক নয়।'

ঠিক এর পরদিন সকালবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ মা আর ঠাকুমার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। কানটা খাড়া করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ বাদে বুঝতে পারলাম দো তলার থেকে তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে আমাদের পাড়ার এক বেড়াল মল ত্যাগ করেছে! জল ঢাললে সারা বাড়ি হবে বলে ঠাম্‌মা কাগজ দিয়ে পরিষ্কার করছে আর মা ন্যাতা দিয়ে মুছছে। মা-র তখনও ঠাকুর পুজো হয়নি। বামুনঠাকুর এল বলে। কিছুক্ষণ বাদে মা চানটান করে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকল। আমি চোখটা বন্ধ রেখেই মা-কে উদ্দেশ করে বললাম, 'বেড়াল অবলা জীব, তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করা তোমার ঠিক নয়।'

কস্তুরী বসু
গ্রাহক নং ৩৯২৯। বয়স ১৪ বছর

খোকন

অনির্বাণ সেনগুপ্ত
গ্রাহক সংখ্যা ৩৭৬৩। বয়স ১২ বছর

'খোকন, ওরে খোকন রে। কোথায় গেলি রে?' এক বয়স্ক মহিলার চিৎকার ট্রেনের ওই কামরার প্রত্যেকটি লোককে চমকে দিল।

'কী হ'ল মাসিমা?'

'খোকনকে দেখছি না। কয়েকটা স্টেশন পরে যে আমি নামব। খোকন কোথায় গেল?'

'চিন্তা করবেন না। ট্রেনের এই কামরাটা এমন কিছু বড় নয়। এখনই খুঁজে দেখছি।' এক পরোপকারী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে মাসি ওরফে ওই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় এদিকে ওদিকে খুঁজে দেখলেন। কিন্তু খোকনের খোঁজ পাওয়া গেল না। 'হায় হায়, খোকন রে! আমি আর পারছি না। আমি আবার অল্পেতেই নার্ভাস হয়ে যাই। উফ্!' এই কথা বলে সেই যে মুখ বন্ধ করলেন আর খুললেন না।

আমি বড়দের কথা শুনলাম, আর নিজের মনে দুঃখপ্রকাশ করলাম। এখন রাস্তায় রাস্তায় ছেলেধরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে বাচ্চাটাকে হয়তো তাদের মধ্যে কেউ তুলে নিয়ে গেছে। এমনও হতে পারে ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু তা হলে পড়ে যাওয়ার সময় সবাই চিৎকার করে উঠত। তা তো হয়নি। আর আমাদের চোখের সামনে একটা জ্যান্ত বাচ্চাকে লোপাট করে দেবে এও কি সম্ভব।

ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে একজন মোবাইলে রেলপুলিশে ফোন করলেন। পরের স্টেশনে ট্রেন থামার পর দু'জন সাদা পোষাকের পুলিশ উঠল। কিন্তু ভদ্রমহিলা এমনই শক পেয়েছেন যে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন। যাত্রীরা যে যার স্টেশনে নেমে যাচ্ছে। ফোন নম্বর দিয়ে যাচ্ছে। খবর পেলে জানানোর জন্যে।

কি আর উপায়, ট্রেনের সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এনে দেখানো হচ্ছে। যদি কোনওটাকে খোকন বলে চিনতে পারেন। বিফল চেষ্টা। হাত নেড়ে কি যেন বোঝানোর চেষ্টা করছেন। যাত্রীদলের মধ্যে কে যেন বুদ্ধি করে খাতা পেন্সিল দিল। যদি কিছু লিখতে পারেন। কিন্তু ওঁর হাত এতই কাঁপছে যে লেখা দূরে থাক পেন্সিল ধরতেই পারছেন না। একবার যাও বা ধরলেন ফেলে দিয়ে শিষ ভেঙে ফেললেন। নাহ্, যতক্ষণ না কথা বলতে পারছেন ততক্ষণ কোনও আশা নেই।

খবরে আমরা সবাই নিরুদ্দেশ ছেলে মেয়েদের দেখতে পারি। কিন্তু এই প্রথম চোখের সামনে একজনকে নিরুদ্দেশ হতে দেখে সবাই হতবাক। এদিকে সব স্টেশনে খবর চলে যাচ্ছে। নিরুদ্দেশ কোনও বাচ্চা পেলে তৎক্ষণাৎ যাতে খবর দেওয়া হয়। ভদ্রমহিলা কোন স্টেশনে নামবেন কে জানে?

এতক্ষণ ধরে ভদ্রমহিলা বলে আসছি ঠিকই, কিন্তু ওঁকে ভদ্রমহিলা না বলে দিদা বলাই বেশি ভালো। দেখে মনে হ'ল ওঁর বয়স নব্বইয়ের দোরগোড়ায়, চোখে বোধহয় ছানিও পড়েছে। একা একা হাঁটাচলা করতে পারেন কিনা সন্দেহ। এর ওপর আবার খোকনকে নিয়ে এসেছেন। বাড়ির লোকের আক্কেল বটে। এরকম বৃদ্ধ মহিলার সাথে কোনও বাচ্চা ছেড়ে দেয়?

আচ্ছা খোকনটা কে তো জানা হ'ল না? নাতি বোধহয়। ভদ্রমহিলা জুলজুল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। যদি খোকনের দেখা পায়। পরের স্টেশনে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক উঠলেন। এঁকে কয়েক স্টেশন আগে এই কামরা থেকেই নেমে যেতে দেখেছি।

ওঁকে দেখেই ভদ্রমহিলা ওরফে দিদার মুখে বোল ফুটল, 'আরে খোকন রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ আমি এদিকে চিন্তায় মরছি।'

আমরা এদিকে খোকনের বহর দেখে থ। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ফরসা রঙ, চাপদাড়ি আছে, মাথায় বেশি চুল নেই, এক হাতে আধপোড়া সিগারেট অন্য হাতে ছড়ি। কোট প্যান্ট পরে। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। আমরা সবাই চমকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছি।

প্রথমে কনস্টেবল দু'জন বলল, 'আপনি খোকন?'

গোঁফের মাঝখান দিয়ে মুচকি হেসে উনি ওদের কথায় সায় দিলেন।

'তা খোকনবাবু, এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন?'

একটু আগে যাকে বাচ্চা ভেবে তুই তুই করে বলা হচ্ছিল এখন তাঁকে রীতিমতো সম্মানের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'আরে আর বলবেন না, কয়েক স্টেশন আগে চা কেনার জন্য মাকে না জানিয়ে নেমেছিলাম। চা পাওয়ার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কোনওমতে শেষের কামরায় লাফ দিয়ে উঠি। ইচ্ছে ছিল পরের স্টেশনে নেমে এই কামরায় চলে আসব। কিন্তু ওখানে হঠাৎ এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। গল্প জমে উঠল। তাই দেরি হয়ে গেল। তারপরে যখন শুনলাম খোকন বলে একটা বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন বুঝলাম খোকন আদৌ বাচ্চা নয়। বিয়াল্লিশ বছরের এই বুড়ো।'

'তা মাসিমা, আপনি এত নার্ভাস হচ্ছিলেন কেন? খোকনবাবু তো আর ছোট নয় যে হারিয়ে যাবে?'

'না গো না। ওর জন্য কি আর ভয় পেয়েছি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমার জন্য। আর কয়েকটা স্টেশন পরে নামব। কিন্তু কোন স্টেশনে নামব তা জানি না। নেমে কোথায় যাব তাও জানি

না। এত বয়স হয়েছে যে নিজেরও ক্ষমতা নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে হঠাৎ খোকনের অনুপস্থিতি আমায় খুব নার্ভাস করে দিয়েছিল।'

'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু একটা কথা কিছু মনে না করলে জিজ্ঞেস করি?' ট্রেনের এক বয়স্ক যাত্রী খোকনবাবুর উদ্দেশে বললেন।

'না না মনে করার কি আছে! বলুন।'

'আপনার মতো বয়স্ক লোকের নাম খোকন কে রাখল?'

'ভুল করছেন। আমার ডাক নাম খোকন দেওয়া হয় আর ভালো নাম সত্যেন্দ্র ঘোষাল। ছোটবেলার দেওয়া নাম তো বড় হলে পাল্টে যায় না। ছোট থেকে যাঁরা খোকন নামে ডাকেন এখনও তাঁরা ওই নামেই ডাকেন।'

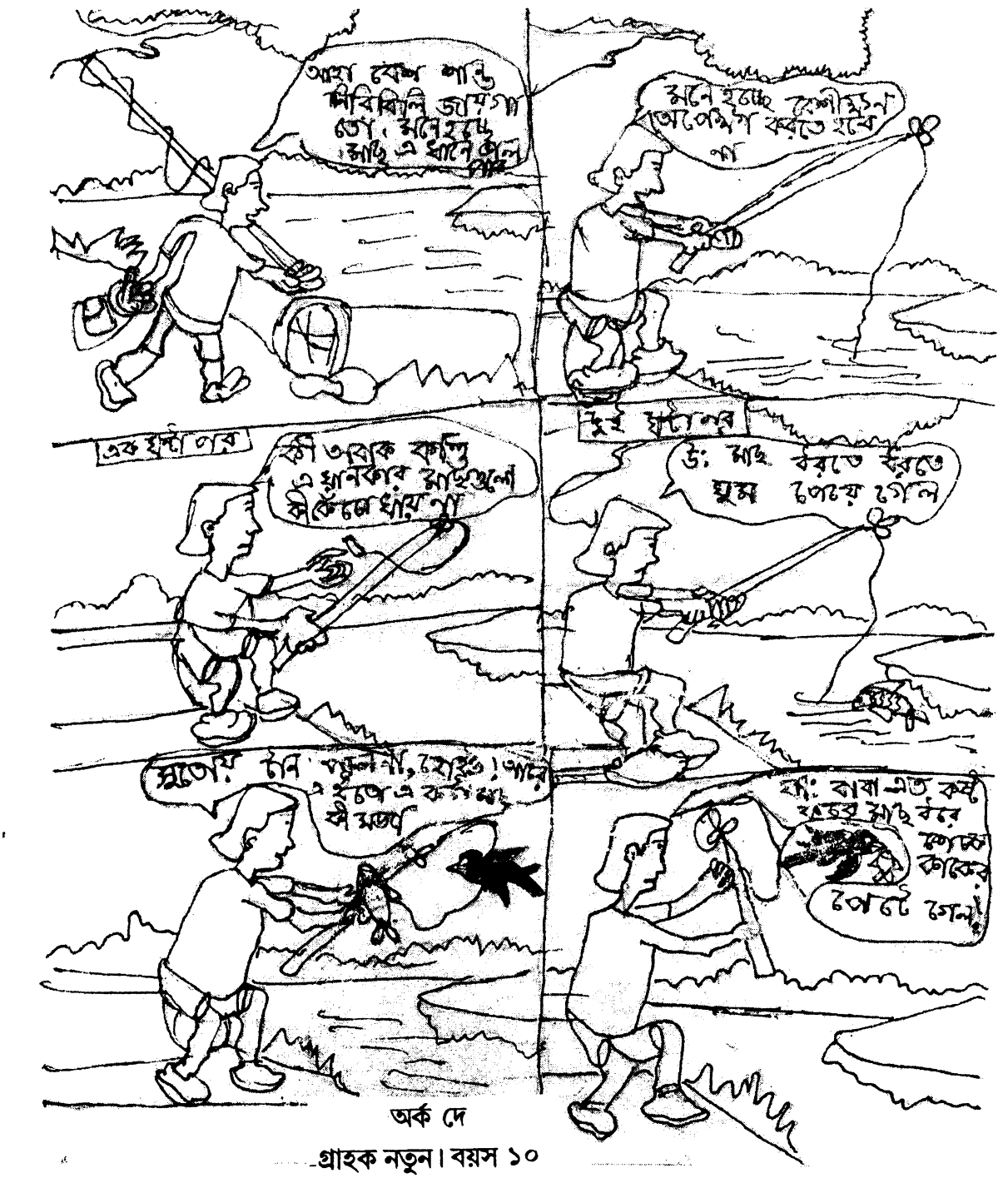

অর্ক দে

গ্রাহক নতুন। বয়স ১০

কমলা লেবু রহস্য

সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ৩৬৭৭। বয়স ১১ বছর

একদিন সকালে আমি ও গল্লুদা বৈঠকখানায় বসে আছি। গোয়েন্দাগিরিতে গল্লুদার তখন বেশ নামডাক হয়েছে। খুব ছোট খুনের মামলার সূত্র ধরে সে বিশাল চোরাকারবারীদের সনাক্ত করেছে। বৈঠকখানায় বসে আছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। গল্লুদা রিসিভারটা তুলে মন দিয়ে কি যেন শুনল, তারপরই রিসিভার নামিয়ে আমাকে বলল, 'এক্ষুনি রেডি হয়ে নে। হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে কেন?'

গল্লুদা বলল, 'সেটা হাওড়া স্টেশনে গেলেই জানতে পারবি।'

বাড়ি থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। এসে দেখি 'জনকল্যাণ' এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে এবং সামনে গিজগিজ করছে পুলিস। গল্লুদাকে দেখে ইন্সপেক্টর সুধীরবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'প্রতিদিনকার মতো আজকেও হাওড়া স্টেশনে পুলিস ছিল। একজন যাত্রী জনকল্যাণে উঠেই প্রচণ্ড জোরে আর্তনাদ করে ওঠে। তাই শুনে ছুটে যায় অনেক পুলিস ও লোকজন। পুলিস উঠে দেখে সিটে শুয়ে আছে এক জোয়ান লোক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে মারা গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে তার দেহে কোনও আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন নেই। ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে তার ব্যাগ দু'টি এবং সিটের তলায় লেবুর খোসা। ব্যাগদুটোর চেন খোলা। তার ভিতর থেকে পাওয়া গেছে কিছু জামাকাপড়, চিরুনি, ব্রাশ প্রভৃতি। ড্রাইভারের কাছ থেকে জানা যায়, ট্রেনটা স্টেশনে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ আউটারে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাড়িতে এসে গল্লুদা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আমি ঘটনাটার কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলাম না। একটা লোক মারা গেল কিন্তু তার দেহে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। এসব আমার কাছে আশ্চর্য লাগল। গল্লুদা বলল, 'সবচেয়ে সন্দেহজনক হ'ল সিটের তলায় লেবুর খোসা ও ট্রেনটির আউটারে দাঁড়ানো। কিছুক্ষণ পরে গল্লুদা রিসিভার তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করল। ফোন করতে করতে তার ভুরু সংকুচিত হয়ে গেল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর নিজের মনে বলতে লাগল, 'স্টেশনের বাইরে গুদাম। হঠাৎ আমাকে বলল, স্টেশনে যেতে হবে, রেডি হয়ে নে।'

আমি চটপট রেডি হয়ে নিলাম। ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা হাঁটতে লাগলাম প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে। হেঁটে চলেছি তো চলেছি। হঠাৎ সেখানে দেখা হয়ে গেল পুলিস ইন্সপেক্টর সুধীরবাবুর সঙ্গে। গল্লুদার সঙ্গে আড়ালে কি কথা হ'ল। দেখলাম, সব কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন এবং বললেন, 'সবাই আমাদের পিছনে এস।'

কিছুক্ষণ পরে চলে এলাম সেই গুদামে। সেখানে কোনও জনপ্রাণীও চোখে পড়ল না। ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরে শুধু চালের বস্তা আর ডালের বস্তা। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার বেশ ভয় ভয় করছে। গল্লুদা ও সুধীরবাবু দু'জনের হাতেই রিভলবার। গল্লুদা সুধীরবাবুর দিকে একবার দেখে নিল। গল্লুদা বলল, 'গুদামঘরে কিছু থাকা অসম্ভব।' হঠাৎ পিছন থেকে একজন পুলিস ছুটতে ছুটতে এল। সে বলল, 'স্যার, লাশ গায়েব।'

গল্লুদা বলল, 'অমি জানতাম লাশ গায়েব হবে। কারণ অপরাধীদের হাত খুব কাঁচা। গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় গল্লুদার চোখে পড়ল লেবুর খোসা ও দুরে কিছু লেবু। গল্লুদা সুধীরবাবুকে দিয়ে দিলেন সেই লেবুর খোসাগুলি। রুমাল দিয়ে তিনি সাবধানে লেবুর খোসাগুলি তুলে নিলেন এবং হুকুম দিলেন, 'এর উপর কোনও হাতের ছাপ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।' তিনি খোসাগুলো তাঁর সহকারীর হাতে দিলেন।

রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে গল্লুদা আর কোনও কথা বলল না। নিজের ও আমার বিছানা করল। তারপর খাবার খেতে লাগল। রাত্রে আমার একদম ঘুম আসছিল না। তাকিয়ে দেখি রাত এগারোটা। গল্লুদা তখনও চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি গল্লুদা উঠে গেছে আগেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনও সূত্র পেলে?'

গল্লুদা বলল, 'একটা বড় সূত্র পেয়েছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

বলল, 'লেবুর খোসা।' আমার খুব হাসি পেল। কিন্তু হাসলে গল্লুদা খুব রেগে যাবে। হঠাৎ মনে পড়লে ট্রেনের সিটের তলায় পাওয়া লেবুর খোসা ও গুদামের সামনে পাওয়া লেবুর খোসা। তবে কি দু'টোর মধ্যে কোনও সংযোগ আছে? গল্লুদাও তখন ভেবে চলেছে। সে বলল, 'আজ সন্ধ্যেবেলা একবার যেতে হবে। আজই হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে এক বিরাট রহস্যের।'

তখন সকাল ৮টা। গল্লুদা আমাকে বলল, 'আধঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া করে বেরুতে হবে। ওর নির্দেশমতো আমি আধঘণ্টার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। প্ল্যাটফর্ম ধরে এলাম গুদামের কাছে। সেখানে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন ইন্সপেক্টর সুধীরবাবু ও আরও অনেক পুলিস। গল্লুদা জিজ্ঞেস করল, 'কমলালেবুর খোসায় কোনও

হাতের ছাপ পাওয়া গেছে?'

সুধীরবাবু বললেন, 'পাওয়া গেছে। কিন্তু!'

'কিন্তু কী?'

'কারুর সঙ্গে সেই হাতের ছাপ মিলছে না।'

গল্লুদা একটু মুচকি হাসল। সুধীরবাবুকে বলল, 'এই গুদাম ঘরের নিচের দেওয়ালটা ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। আমার বিশ্বাস সেখানে নিশ্চয় কোনও গুপ্ত সুড়ঙ্গ রয়েছে।' অনেকক্ষণ চেষ্টার পর একটা দেওয়ালে হাত দেওয়া মাত্রই খুলে গেল সেটা। ভেতরে যেতেই দেওয়ালটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সুধীরবাবু ও গল্লুদা ভিতরে লেবুর গন্ধ পেল। সবাই নিস্তব্ধ। কেউ কোনও কথা বলছে না। এ সময় গল্লুদার নজরে পড়ল একটা কারখানা। সেখানে গিয়ে একটা দরজা খুলতেই দেখা গেল গঙ্গা। গল্লুদা বলল, 'এই গঙ্গাতেই ওরা লাশটা ফেলে দিয়েছে।' ভেতরে আরও অনেক লেবুর খোসা পাওয়া গেল। কিন্তু কোনও মানুষের শব্দ পাওয়া গেল না। গল্লুদা বলল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা না আসছে ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ভেতরে দেখতে পাওয়া গেল একটা দেওয়াল আলমারি। আলমারির উপরে একটা ছাতার বাঁট লাগানো। গল্লুদা বলল, নিশ্চয়ই এখানে আরও কোনও গুপ্ত সুড়ঙ্গ রয়েছে। আলমারির উপর ছাতার বাঁটটা ধরে টানুন সবাই।' এক হ্যাঁচকা মারতে খুলে পড়ে গেল আলমারিটা। সুধীরবাবু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। সবাই তাঁকে ধরাধরি করে তুলল। ভিতরে দেখা গেল আরও একটা কারখানা। সেখানে লেবুর রস তৈরি হচ্ছে। গল্লুদা বলল, ওই লেবুর সঙ্গে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ফ্রুটজুস হিসেবে ট্রেনে বিক্রি করে এবং যাত্রীদের জিনিসপত্র লুটপাট করে।'

আস্তে আস্তে সুধীরবাবুর কাছে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ সারা সুড়ঙ্গে গর্জে উঠল বন্দুকের আওয়াজ। কতকগুলো লোক পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে রিভল ভার। গল্লুদাও পালটা গুলি চালাতে লাগল। গল্লুদা বলল, 'চটপট ওদের ধরুন। ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও স্পিড-বোট আছে। আর তাতে করে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। চটপট গুদাম ঘিরে ফেলুন।'

কিন্তু তার আগেই ওরা স্পিড বোটে চড়ে পালাল। তাড়াতাড়ি বোটে উঠতে গিয়ে একজন পড়ে গেল জলে। পুলিসের হাতে সে ধরা পড়ল। গল্লুদা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'হোসেন।'

তার কাছ থেকে জানা গেল সে গুদামঘরে কাজ করে, এর মালিক হচ্ছে সুব্রত বোস। তার কয়লার দোকানও আছে। সুব্রত বোস সম্পর্কে সে আর কিছু জানে না। কয়লার দোকান শুনে গল্লুদার ভুরু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। লোকটি আর কিছু বলতে পারল না। গল্লুদা সুধীরবাবুকে বলল, 'আপনি একে আপনার হেপাজতে রাখুন।'

বাড়ি ফিরে এসে গল্লুদা বলল, 'আজ অনেক পরিশ্রম গেছে, আর নয়। কাল আবার রাণীগঞ্জে যেতে হবে।'

পরদিন সকাল ৯টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাণীগঞ্জের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করতেই সুব্রত বোসের দোকান পাওয়া গেল। বিশাল মাপের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে লরি। গল্লুদা সুব্রত বোসকে জিজ্ঞেস করল, 'এই কয়লা কোথায় যাচ্ছে?'

সুব্রতবাবু রুক্ষ গলায় উত্তর দিল, 'কলকাতায়।'

'কলকাতার কোথায়? গুদামঘরের কাছে না?'

সুব্রতবাবু চমকে উঠলেন। গল্লুদা বলল, 'লেবুগুলো একটু দেখতে পারি কি?'

সুব্রতবাবু বলল, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? কয়লার দোকানে লেবু চাইছেন।'

'কয়লার তলায় কী আছে দেখতে পারি কী?'

সুব্রতবাবু হাঁ করে তাকিয়ে আছেন গল্লুদার দিকে।

গল্লুদা বলল, 'হোসেনকে কি চেনেন? সুধীরবাবু, পুলিসকে বলুন, দোকান সার্চ করতে। কাউকে পালাতে দেবেন না।'

ধরা পড়তে পড়তে সুব্রতবাবু বললেন, 'আমাকে যে এই সব বলছেন কোনও প্রমাণ আছে কি?'

সুধীরবাবু বললেন, 'কয়লার তলায় লেবু কেন?'

'লেবু যে আমার তার কী প্রমাণ আছে?'

গল্লুদা বলল, 'হাতের ছাপগুলো এনেছেন?'

'হ্যাঁ, এনেছি।' সুব্রতবাবু আর কিছু বলতে পারল না।

হঠাৎ সুধীরবাবু বললেন, 'ওই দেখুন একজন পালিয়ে যাচ্ছে।' গল্লুদা ছুটে তার পিছনে ধাওয়া করল ও ধরে ফেলল। বলল, 'মুখটা চেনা লাগছে না। দেখুন তো কে?'

মুখ তুলতেই দেখা গেল সেই জনকল্যাণ এক্সপ্রেসের ড্রাইভার। সুধীরবাবু সেই দ্বিতীয় লেবুর খোসায় পাওয়া হাতের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন হুবহু মিলে যাচ্ছে। সন্দেহ সত্যে প্রমাণিত হ'ল।

বাড়ি ফিরে এসে গল্লুদা সুধীরবাবুকে বলল, 'আমার সবচেয়ে সন্দেহ হল যখন দেখি মৃতদেহে কোনও ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন নেই। আমি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে পারি যে জনকল্যাণ এক্সপ্রেস ঢোকার সময় লাইন ব্লক ছিল না। সিগন্যাল দেওয়া ছিল, অথচ ট্রেনটি আউটারে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই সন্দেহ গিয়ে পড়ে ড্রাইভারের উপর।'

গল্লুদার এই গোয়েন্দাগিরির কৃতিত্বের খবর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

এবার পুজোয়

কাহিনী ঘোষ

গ্রাহক সংখ্যা ২৭০২। বয়স ৭বছর

এবার পুজোতে আমাদের বেড়াতে যাবার কোনও ঠিক ছিল না। হঠাৎই ঠিক হ'ল আমার কাছাকাছি কোথাও যাবে। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করছিল না কারণ আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই দুর্গাপুজো হয়।

একুশ তারিখ অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন আমরা বাসে চেপে বসলাম। পরের দিন সকাল ন'টায় বাস আমাদের শিলিগুড়ি পৌঁছে দিল। সেখানে বেশি সময় নষ্ট না করে মারুতি ভ্যানে করে সোজা কার্সিয়ং চলে গেলাম। আমার বন্ধুদের সবারই দার্জিলিং ঘোরা, কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। এবার আমি দার্জিলিং গিয়ে পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিলাম যদিও জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে মেঘের ঢোকা দেখতে পেলাম না। তারপর আমরা কার্সিয়াং ফিরে এলাম। খেয়েদেয়ে চালসা গেলাম।

চালসা জায়গাটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে। সেখানকার জঙ্গলে চিতাবাঘ, হাতি গণ্ডার, হরিণ এসব থাকে।

আমরা যখন গাড়ি করে জঙ্গলে যাচ্ছিলাম তখন দেখি এক পাল বাচ্চা হাতি খেলা করছে। সমীরকাকু তখন গাড়ি থেকে নেমে ফটো তুলছিল। একদিন আমরা চা বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়েছিলাম। মুর্তি নদী আর কুর্তি নদী দেখেছি। এই যাঃ, বলতেই ভুলে গেছি! আমরা মাঝখানে একদিন ঝালং আর সামসিনগ্ থেকেও ঘুরে এসেছি, ঝালং থেকে ভুটান দেশের ঘর বাড়ি দেখা যায়।

চালসাতে আমাদের পাশের বাংলোতে শিলাজিৎকাকুরা এসেছিল। শিলাজিৎকাকু ভালো গান গায়। শিলাজিৎকাকুর ছেলে মেঘ আমাদের স্কুলেই পড়ে। আমরা দু'জনে অনেক নুড়িপাথর কুড়িয়েছিলাম। আমরা ফাঁক পেলেই বাগানে খেলতাম। দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরার দিন চলে এল। কেমন করে যে সাতটা দিন কেটে গেল!

ময়নার দুঃখ

সৌমিক সরকার

গ্রাহক সংখ্যা ?। বয়স ১১বছর

সকাল বেলায় ডালে বসে
ছোট্ট পাখি ময়না
বললে কেঁদে, 'আমার সাথে
খোকন কথা কয় না।'
খোকন বলে, 'কেমন পাখি
একটুও তর সয় না
কেমন করে বাইরে যাব?
পড়াই তো শেষ হয় না।'

সুকুমার রায়
পুনরজিৎ রায়চৌধুরী
গ্রাহক নং ৩৯১৫। বয়স ১৩ বছর

WITH BEST COMPLIMENTS

from

A Well Wisher

Regd.No. ML/S/WB/RNP-212 R.N.I. No. 12007/64 **SANDESH** April 2002 Price Rs. 12.00

শারদীয়া সন্দেশ ১৪০৯

লিখছেন—

মহাশ্বেতা দেবী ● সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ● অন্নদাশঙ্কর রায় ● নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
তারাপদ রায় ● গৌরী ধর্মপাল ● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ● নবনীতা দেবসেন ● শঙ্খ ঘোষ ● পার্থ বসু
অরুণিমা রায়চৌধুরী ● সুচিত্রা ভট্টাচার্য ● শৈলেন ঘোষ ● অশোক দাশগুপ্ত ● অনিতা অগ্নিহোত্রী
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ● তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ● অরূপ বসু ● অলক চট্টোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ ঘোষ
দীপঙ্কর বিশ্বাস ● বলরাম বসাক ● অশোক দাশগুপ্ত ● সঞ্জীব সিংহ ● প্রণব মুখোপাধ্যায়
রেবন্ত গোস্বামী ● বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ● পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অন্যান্য সন্দেশী লেখক, গ্রাহকেরা ও আরও অনেকে।

জুলাই-এ :

বিশেষ সংখ্যা,
হাসি বিভাগ সহ

লিখছেন :

মহাশ্বেতা দেবী * দীপঙ্কর বিশ্বাস * হিমানীশ গোস্বামী * নবনীতা দেব সেন * ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
প্রণব মুখোপাধ্যায় * রেবন্ত গোস্বামী * অমিতানন্দ দাশ।

পুনর্মুদ্রণে : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় * লীলা মজুমদার * শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নলিনী দাশ * অজেয় রায় * ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পুজোর পরেই নতুন 'সন্দেশ' : সূচীপত্রের বাঁদিকে খবর

সন্দেশ কার্যালয়

১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯

✆ : ৪৬৬ ৪৯১৯, adas@onlysmart.com